আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালা/২০

নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প

নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটগল্প

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

ভূমিকা

নিজের গল্প সংকলনের ভূমিকা লেখা দুঃসাধ্য। এড়িয়ে যাবার উপায়ও নেই। অতএব বাধ্য হয়েই লিখতে হল। প্রথম চারটি ছাড়া বাকি গল্পগুলি গত এক দশক ধরে লেখা যে দশকে মানুষের এগিয়ে চলার, শোষণমুক্তি ও সমাজব্যবস্থা পালটানোর মডেল পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ও বামপন্থীদের আবশ্যিক আত্মসমীক্ষার অভাবের কারণে অনেকটাই তছনছ হয়ে গেছে। যে শতক সবচেয়ে আশা জাগিয়েছিল সেই শতক শেষ হচ্ছে অবসাদে, বিষাদে, যন্ত্রণাজর্জর অবস্থায়। আমি দৈনন্দিনতায়, প্রত্যহ, নিকটে ও দূরে, নিয়ত যা দেখতে পাই তা হল পরতে পরতে, স্তরে স্তরে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ, নতুনতর ঔপনিবেশিকতা ও সংস্কৃতি-সাম্রাজ্যবাদের অমানুষীকরণের দেখা না দেখা হাতকড়া ও চোখভুলোনো ঠুলির ভার। সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদের বালক বয়সের প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার চেয়েও এ যেন অধিকতর মারাত্মক, জঘন্য ও অপমানজনক। এই দলিত মথিত মানুষ ও তাদের জীবনের এক বিচিত্র ক্যালেইডোস্কোপের মধ্যে আমার জীবন কাটছে। চারপাশে তাই আমি দেখি। কিন্তু চূড়ান্ত নিরিখে এই বাস্তবকে আমি চিরস্থায়ী বলে মানি না। বাস্তবকে পালটাতে হবে। হবেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবশ্যই একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। শুধু আমার দেশ বা উন্নয়নশীল ও গরিব অন্যান্য দেশ নয়, গোটা দুনিয়ার মানুষকে এক নিষ্ঠুর 'ভুলা মাসানের পাকে' ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই অপদেবতাকে আমি ঘৃণা করি ও তার নিঃশর্ত মৃত্যু চাই। সে আমাকে নতিস্বীকার করাতে চায়। বোঝাতে চায় যে ইতিহাসের সামনে আর কোনো পথ নেই, মতাদর্শ নিছকই হাত উড়ে যাওয়া মানুষের ফাঁকা আস্তিন যা গুটিয়ে কোনো লাভ নেই। সে যত একগুঁয়ে আমিও তার কথা বুঝতে ততটাই নারাজ। শেষ হাসিটা অপদেবতা নয়, মানুষই হাসবে। ইতিহাস সেই ভরসাই দেয়।

যে অস্থির ও ঘটনাবহুল কালপর্বের মধ্যে এই গল্পগুলি লেখা হয়েছে তাতে করে দেখার ও বোঝার চোখ ও মন পালটে যেতে বাধ্য। প্রকাশভঙ্গিও। তবে অস্তিত্বকে যা অভিমুখিনতা দেয় সেই মতাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রদবদল বা পিঠটান দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মনে হয় নিরেট, নির্বোধ আনন্দের সময়ের থেকে বিশ্বব্যাপী এই দুঃসময় প্রয়োজনীয়ই ছিল। এই সময় সম্ভবত এই শিক্ষাই দেয় যে কল্পস্বর্গবাদী হয়ে বেঁচে থাকা, বিশেষত এই আশা-নিরাশা, নির্মাণ ও নৃশংসতার শতকের শেষভাগে চূড়ান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা হবে। আমার গল্পগুলিতে এই বোধের ছিটেফোঁটাও যদি পাঠক খুঁজে পান তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

'পরিশেষে প্রকাশকদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের যাঁরা আমার লেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আমাকে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন।

কলকাতা
১৫·১২·৯৫

নবারুণ ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

খোঁচড়	১১
প্রতিবিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক	২৩
মার্ডারারের ভাই	২৯
বুড়া কাহারের পুঁজিপাটা	৩৭
ফোয়ারার সেই মানুষজন	৪৪
ফোয়ারার জন্যে দুশ্চিন্তা	৪৯
শেষ রাত	৫৫
কালমন্ ও মোগলাই	৬২
পাঁচুগোপাল	৭০
এক টুকরো নাইলনের দড়ি	৭৭
হাওয়া হাওয়া	৮৩
মরণদান	৯০
মাথা নেই তো হয়েছে কি	৯৭
টয়	১০৪
৪+১	১০৭
ফ্যাতাড়ু	১১২

খোঁচড়

শার্টের কলারটা শেষ হবার কাছে ঘাড় আর পিঠের মাঝামাঝি ইঞ্চি দুয়েক জায়গায় ওর একটা চুলকুনির অসুখ আছে। চামড়াটা ওখানে নরম, লোম নেই, তেলতেলে আর ছিট ছিট দাগ। অসুখটা ইচ্ছের সঙ্গে বাড়ে-কমে। কাউকে খুন করার আগে জায়গাটা ভিজে দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে আর চিড়বিড় করে করে চুলকোয়—রস কাটে—তখন ওর চোখদুটো ঠাণ্ডা বরফকুচি হয়ে আসে আর ও বুঝতে পারে যে কারুর লাশ আনবার সময় এখন খুব কাছে। সমকামনায় সময়ের তোবড়ানো মুখটা ওর মুখে ঘষে। ইচ্ছেটা গায় রোঁয়া রোঁয়া একটা জ্যান্ত মাংসের ডেলা। ডানপকেটে সিগারেটের কালো গুঁড়ো, নোনা ঘাম আর যৌনগন্ধের মধ্যে রিভলভারের কালো কোটরটা চোখ খুলে তাকায়, শরীরটা সাড় আর অসাড় হয় একই সঙ্গে, হাতের আঙুলগুলো অবশ অথচ যান্ত্রিক হয়ে বেঁকে আসে, কালচে থ্যাবড়া নখগুলো হিম হয়ে ওঠে। চুলকুনির পোকাগুলো শিরার মধ্যে কুরতে থাকে, দাঁতের ভিতর দিয়ে হাড়ের মধ্যে চলে যায়। তখন ও মুখে থুথু জমায়, দাঁত চোষে আর জন্তুর মতো দেওয়ালে বা ভ্যানের জালে পিট ঘষে, ছেঁচড়ে গিয়ে চুলকুনিটা জ্বালা করে আর টক উদগ্র এবং বিশেষ ঘামের গন্ধ পায়। ওর ঠোঁটদুটো মোটা আর ছাল ওঠা। হাসি পায় ওর কারণ ও বুঝতে পারে এখন আর কিছুতেই কেউ ঘটনাটা আটকাতে পারবে না, মাংসের ডেলাটা যেন বলে দেয় একটু পরেই ও একটা লাশ নিয়ে ফিরবে—লাশ এখনো বেঁচে আছে—এখনো জানে না সুতরাং সতর্কতা অবান্তর প্রশ্ন। হাতের লোমগুলো সির সির করে দাঁড়িয়ে ওঠে।

লাশটা পায়ের কাছে পড়ে থাকে—উপুড় বা চিত—ও পা দিয়ে লাশটাকে খোঁচা মারে। আর ভ্যানচলার ঝাঁকুনিতে বুঝতে পারে যে মড়াটা থিতোচ্ছে। কখনো কখনো গরম থাকে, ঘিলু পোড়া চামড়া আর রক্তের গন্ধ পাওয়া যায়। ওর চুলকুনিটা কমে আসে তখন, মুখের থুথুটা গিলে ফেলে শুধু ঘামের টক উগ্র গন্ধটা যায় না। গন্ধটা তাড়াবার জন্যেও সিগারেট ধরায়, সিগারেট খুঁজতে ডানহাতটা প্রতিবারই রিভলবার রাখার ডান পকেটে চলে যায়, রিভলভারটা ভারী লাগে আর ওর মুখের ওপর,

এবড়োখেবড়ো দাঁতের ওপর চলন্ত রাস্তার আলোর ছায়ায় চকমকি কিলবিল করে। ভ্যান চলার ঝাঁকুনিতে লাশটা লাফায়, নড়াচড়া করে, মাথা নাড়ায়, সব কথায় না বলছে বা অন্ধকারের পাস ফিরে শুতে চাইছে বলে মনে হয়। জামার ওপর বুলেটের পোড়া গর্তের চারপাশে রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে থাকে, চোখদুটো অল্প খোলা বা বোজা, কখনো দমকা বাতাসে এসে বেওয়ারিশ চুলগুলো নিয়ে খেলা করে। রাস্তার আলো অন্য পুলিশদের বন্দুকের নলে চকচক করে। সবাই চুপ করে থাকে বা নিচুগলায় দোহাতি হিন্দিতে কথা বলে, হাসে। ও তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করে সিগারেট খায়। লাশটার ওপর বা অন্ধকারে ছাই ফেলে, জুতো দিয়ে ছোঁয়। জিভ কাঁপিয়ে গান গায়। ঝাঁকুনিতে আর লজঝড়ে টিনের শব্দে তাল মিলিয়ে লাশটা বোকার মতো নড়াচড়া করে, লাফায়। গাড়িটা থানায় ঢোকাবার আগে জ্বলা পেট্রলের কালো ধোঁয়ায় ওর মৌজটা ভেঙে যায়। ততক্ষণে সরতে সরতে লাশটার একটা ঠাণ্ডা হাত যদি পায়ের ওপর এসে পড়ে তবে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। লাশের মার নামে খিস্তি করে।

(মৃতদেহ যখন এ জাতীয় প্রস্তাবের জবাবে রা কাড়ে না তখন মৃতের নির্বাক অস্তিত্ব ও লাশসমেত সামগ্রিকতার উপর ঘাতকের কর্তৃত্ববোধ জন্মে এবং বহু অনুশীলন বা হত্যার পর ঘাতকের এই মানসিকতা যে কোনো জীবনের ন্যায় নিজস্বতা অতিক্রান্ত বিকাশ ও বিবর্তনে ক্রিয়াশীল সুতরাং যে কোনো জীবিত ব্যক্তিই এখন এই জটিল চিত্তানুযায়ী ক্লীব বা মড়া হইবার উপযোগী। সরকার অনুমোদিত ঘাতকের এই বিচিত্র গুণপনার সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক চৌম্বকক্ষেত্রের কোনো ভৌতিক বাণিজ্য আছে কিনা তাহা রহস্যাবৃত এবং এই অনুসন্ধান সম্ভবত বিপদজনক।)

লম্বা একটু কুঁজো পিঠটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে ও শুনছিল পুরোনো কেস ফাইল রাখার ধুলোপড়া কাঠের তাকটার ওপারে ভারী একটা বাড়ি মারার শব্দ হচ্ছে—ধুপ! ধুপ!—ওখানে একটা কেঁদো বুড়ো টিকটিকি আছে—ত্যালাপোকা ধরে আর কাঠের গায় আছড়ে আছড়ে মারে। দেওয়ালে মশা মারার দাগ। বিরাট সরকারি ক্যালেন্ডার। দাসের টেবিলে একটা ট্রানজিস্টার— খুব আস্তে নানারকম শব্দের মধ্যে হিন্দি খবর হচ্ছে কিন্তু দাস ঘুমোচ্ছে—আবার গান শুরু হলে ঠিক জেগে উঠবে। দেওয়ালগুলো কালচে বলে জোরালো বাল্বের আলোও মরা। বাল্ব ঝোলাবার তারে মাছি বসে। লক-আপে একটা ছেনতাই ফ্যাঁশা গলায় গান গাইছে—কতকগুলো কথা বলার টুকরো, বুটের মচ্ মচ আওয়াজ—গানটা থেমে যায়, তালা খোলার শব্দ। ওর টেবিলে একটা খালি কোকাকোলার বোতল—একটা মাছি বার বার ভেতরে ঢুকছে আর ওর আঙুলগুলো একটু একটু নড়ছে—রেডিওটা বাজছে। ওর মনে হল একটু একটু করে ঘুম ধরছে চোখে কিন্তু বিকেলবেলা সিঙাড়া খেয়েছিল—পেটের মধ্যে গজ্ গজ্ করছে তবে সুবিধের বিষয়টা এই যে চা পড়লে অম্বলের অস্বস্তিটা দমে আসবে। চা এসে পড়ল বলে। টিকটিকিটা এখনো আরশোলাটাকে আছড়াচ্ছে (কুমীরের বাচ্চা)—তবে এখন অনেক থেমে থেমে—রেডিওর আওয়াজ আর ছেনতাই-এর গান মিশে যাচ্চে—একটু ঝুঁকে পড়ে ও—টিকটিকিটার পিট হলদেটে আর আরশোলাটাকে কামড়ে ধরে আছে বলে ব্যাটার পাখনাগুলো ছেৎরে আছে (সবুজ চোখদুটো ঠাণ্ডা··· আরশোলার পায় কাঁটা কাঁটা, শুঁয়োদুটো একটু একটু নড়ে, ছেনতাইটা ঝিম ঝিম করে ইনিয়েবিনিয়ে হিন্দি খবর বলছে (সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকার দুজন ঘরের কোণে খড়ের ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসে—ছেনতাইটা পা ডলে দিতে বলে—কনস্টেবল হাসে) কালো একটা রং জলে

(রক্ত) যেমন করে ছড়ায় তার চেয়ে অনেক আস্তে একটা (হেডলাইট দুটো কালো ঠুলি পরানো···জলের মধ্যে ছড়াচ্ছে—জলটা চৌবাচ্চার মধ্যে···অনেকগুলো বোমা ভিজিয়ে রাখা আছে জলে (ডি অ্যাক্টিভেট করার জন্যে)—বোমাগুলো জলের তলায় হাল্কা হয়ে যায় (আর্কিমিদিস)··· টিকটিকির শাদা পেটটা খাবার গেলার পর ফুলে ঢোল হয়ে আছে ব্লব্··· ব্লব্··· সাইলেন্সারে গুম্ হয়ে যায় আওয়াজ···ওয়েবলি স্কট্···ওয়েবলি··· চামর যন্তর ··· দাসটা শালা এক নম্বরের ত্যাঁদোড়··· পসথ্যুমাস পুলিশ মেডেলও পাবে না··· পিকরিক অ্যাসিড, লাশচেরাই-এর ছড়ানো টেবিল, নাইট্রোগ্লিসারিন··· এম্পুল··· কেমিস্ট্রির দুঁদে দুঁদে ছেলে সব হারামির বাচ্চা—চৌবাচ্চাটার মধ্যে হাত ডুবিয়ে ও বোমাগুলো ছোঁয়··· ভিজে দড়ি জড়ানো গোল গোল··· ঠাণ্ডা অথচ ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাঁশ করে একটু শাদা ধোঁয়া···ঝিলিক···আরশোলা মুখে টিকটিকিটা লাফিয়ে গায়ের ওপর পড়ে ঝুরঝুর করে দেওয়ালের বালি নিয়ে··· ভ্যানের মেঝেতে ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে রক্ত ধোবার শক্ত···ওসি,···ওসি-র ঘরের পর্দাটা উড়ছে; পাখা ঘুরছে··· টি···গুম্··· বিস্ফোরণে সমস্ত বাড়িটা কাঁপে··· হাতে মাল ফেটেছিল সাধনের লাশের চোখগুলো ঝুলে পড়েছিল··· ঝলসানো মুখের কয়লার মধ্যে দাঁত···জানালার কাচগুলো খিলখিল করে ভেঙে পড়ে (ব্লু চ্যানেল—ওয়্যাপলেসে অবিশ্রান্ত মেসেজ)··· গন্ধকের হলদে ধোঁয়ায় বোমাগুলো বলের মতো লাফাতে লাফাতে দৌড়ে বেড়ায়···

—"চা খায়েন, চা খায়েন—ঝিমুনি টিমুনি সব চইলা যাইবো"—দাস একহাতে চায়ের গেলাশ নিয়ে কথাগুলো বলছে। বাইফোকাল চশমার ওপারে পরিহাসরত চোখ। দাসের সঙ্গে ওর গোঁফগুলোও হাসছে। ও একটু গলা ঝাড়ে, নিজের গেলাশটা নেয়, অভ্যাসবশত ফু দেয় তারপর সুড়ুৎ করে চুমুক লাগায়। একটা পিঁপড়ে ভাসছিল, আঙুল ডুবিয়ে তুলে এনে টেবিলের নীচে লাগায়। একটু ঘুমিয়ে দাসের চোখ ফুলেছে, দাস বকে চলে—"আইজ দুপুরে বোঝলেন, এক প্রফেসার—কি এক কলেজে পড়ায় আসছিল। কয় কিনা ওসি-র কাছে দেখা করব—ক্যান্ ওসি-র কাছে ক্যান? খালি মাথা নাড়ে আর কয় যে হে নাকি আমি বুঝুম না। শ্যাষে গেল ওসি-র কাছে। বাকিটা অবশ্য এভিডেন্স—এস আই মল্লিক তহন ওসি-র ঘরে ছিল, মল্লিক কইলো কি য্যান কথাটা—ওই যে সব ক্রিমিনালগোর কথাবার্তার বই লিখতাসে—শোনেন একবার কথা—আরে ওই চোরডাকাতের কথা যেমন। বোঝলাননি··· যেমন আই-বি রে কয় খোঁচর, পিস্তলের কয় চেম্বার···এইসব লোয়ার ক্লাস কথা আর কি··· ভাবেন একবার কি অবস্থা! রবিঠাকুর শরচ্চন্দ ছাইড়া এইবার পকেটমার আর চোর ধাউড়ের কথা লইয়া টানাটানি। আরে বাবা, তা পুলিশের কাছে আসা ক্যান বাপ? আসল লোকদের জিগাইলে না ঠিক ঠিক কথা জানতে পারতা। হেঁঃ হেঁঃ বুঝ করেন একবার—কলেজে পড়ায় আর চোরধাউড়ের বুলি শিখায়··· ভাবতেই পারি না···হেঁঃ হেঁঃ"—দাস বকে চলে আর হাসে। দাস খুব গপ্পোবাজ— লোকটা ভালো— ধান্দাবাজি করে না কিন্তু তবু ওর মনে একটু খিচ আছে—শুধু মনে হয় যে দাস ওকে ভয় পায়—যখন হাসে তখনো চোখে ভয়টা কামড়ে থাকে। ও গভীর তৃপ্তি সহকারে চা খায় আর দাসের কথা শোনে। একটু একটু হাসে। কতকগুলো উত্তেজিত গলার আওয়াজ—গেলাশটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিনি গোলে। বুটের শব্দে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। গল্পটা নিঃসন্দেহে মজার কিন্তু কিছু বলার আগেই দৌড়ে আসে এস আই মল্লিক। তাল সামলাতে চৌকাটে হোঁচট খায়? বয়স কম—উত্তেজনার অস্থির—ওকে গলা নামিয়ে বলে "কাল্লীতলা যুবক সমিতির জলসায়

গৌতম বিশ্বাস গান শুনছে। এইমাত্র কোটন বলে গেল—অথেনটিক রিপোর্ট।" মল্লিক হাঁপাচ্ছে—কপালের শিরগুলো ফুলে উঠছে—নার্ভাস টাইপ। কথাটা শেষ হবার আগেই ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। শরীরের কুঁজো ভাবটা চলে গেছে। চাটা এক চুমুকে তলানি উপুড় করে খায়, ঠক করে গেলাশটা রাখে তারপর বেল্টটা আঁট করতে করতে বেরোয়। দাস জিজ্ঞেস করে—"কি কইলেন মল্লিকবাবু?"—ওরা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। দাস ওদের বেরিয়ে যাওয়াটা দেখে তারপর রেডিওতে কান পাতে। ওর রেখে যাওয়া গেলাশের গা বেয়ে চিনি নীচে নামছে। নামছে। জোর করে দেয় রেডিওটা। বাইরে ভ্যান স্টার্ট দেবার শব্দ—চিৎকার— বারান্দা দিয়ে কনেস্টবলের বুট পরা দৌড়ের শব্দ··· ইয়ে আকাশবাণীকে পঞ্চরঙ্গী কারিক্রম···

···গৌতম বিশ্বাস— অ্যাকশান না করলেও ঘোড়েল অর্গানাইজার··· শুয়োরের বাচ্চা বহুদিন বেপাত্তা···অথেনটিক রিপোর্ট···অথেনটিক···ভিড়ের মধ্যে ছেলেটাকে কায়দা করতে হবে···একবার দৌড়লেই শালা ক্যাঁচাল—বারান্দা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে মল্লিককে জিজ্ঞেস করে—"খুব ভিড়?"—"ভিড় আছে, বোম্বের আর্টিস্ট আসছে।"

বোম্বের আর্টিস্ট আসছে তাই খুব ভিড়···মল্লিক ছেলেটা কাঁচা···রক্ত দেখলে উলটে দেবে···গৌতম বিশ্বাস সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গান শুনছে···বহুদিন ফেরার···এ তো সেই মেডিক্যাল কলেজের সেল সেক্রেটারি···ঘাগু মাল···এইবার শালার ফাইল বন্ধ হবে···কাচটা ছোপধরা, জালঢাকা। হেডলাইট ঝলসে উঠতে লম্বা আলোয় থানার গেটটা দেখা যায়।

ও ভ্যান ড্রাইভার গুরুঙের পাশে বসে। চারটে প্লেন ড্রেস লাফিয়ে ওঠে। ভারী দেহের ওজনে কিঁচ কিঁচ স্প্রিঙের শব্দ করে গাড়িটা দোলে। চলন্ত অবস্থায় তারা পেছনের দরজা টেনে বন্ধ করে। জালের মধ্যে গোল গোল ফোকার। ভ্যানটা থানার গেট পার হয়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাস্তার মোড় ঘোরে। আলোয় দেখা যায় একট কুকুর রাস্তা থেকে সরে গেল। ওর পিঠটা চুলকোতে শুরু করেছে। চোখগুলো কুতকুতে, ছোট আর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মুখ লালা কাটছে। লালায় তামাকের কুচি। ও আঙুলগুলো নাড়ায়—একটু অসাড় আর ঠাণ্ডা। পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারটা বের করে, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাইলেন্সার লাগায়। নলের ওপর আঙুলের ছাপ পড়ে। জটলার মধ্যে ছুটলে গুলি চালানো যাবে না অবশ্য ছুটতে যদি পায়। রাস্তার আলো ওর একটু ফাঁক মুখের মধ্যে দাঁতের ওপর কাঁপে। ছোপ! সাইকেলের ওপর শাদা শার্ট পরা পেছনে চলে আসে। গৌতম বিশ্বাস মুখটা মনে পড়ে··· জ্যান্ত মুখটা না এলেও ফটোগ্রাফটা মনে পড়ে··· নিজের মুখে থুথু জমছে··· গৌতম বিশ্বাস··· স্পষ্ট দেখতে পায় ফটোগ্রাফটা··· ভ্যানটা মোড় ঘোরে আবার··· দারুণ জোরে চলছে··· প্রায়ান্ধকার রাস্তায় কতকগুলো ফুলকি··· চুলে অনেক তেল দেয় বলে মোটা ভারী চুল বাতাসে ওড়ে না··· গাড়িটা ব্রেক কষার জন্যে ক্যাঁচ করে শব্দ হয়··· হেডলাইটে মেয়েদের ইস্কুলের পাঁচিলটা দেখা যায়··· পোস্টার··· বম্বের আর্টিস্ট আসছে তাই খুব ভিড়··· গাড়িটা আস্তে হয়··· হেডলাইট দুটো নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে··· গান শুনছে এখন, গুরুঙকে ও কালীমন্দিরের উলটোদিকে থামাতে বলে। গাড়িটা গুঁড়ি মেরে চলে। যুবক সমিতির মাঠটা আর কয়েকটা বাড়ি পরে। লাইব্রেরির ইট বের করা ঘরটা শেষ হলে গুরুঙ বড় ভালো চালায়··· সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আর্মি ট্রাক চালিয়েছিল আরাকানে··· পাকা হাত··· অন্ধকার ভ্যানটা প্রায় শব্দ না করে থামে···

··· দরজাটা খুলে নামে··· চোখদুটো এদিক ওদিক লেপটে দেখে নেয়··· কয়েকটা ফালতু লোক দেখছে পিঠে চুলকুনিটা চিড়বিড় করে জ্বালা করে··· হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ খিঁচিয়ে চুলকোয়—দুজন প্লেনড্রেস ওর হাত কুড়ি পেছনে চলতে থাকে। ওরা দুজন ধুতি, বুট আর টেরিলিনের ঝোলা শার্ট পরা··· কোমরের কাছে গুঁজে রাখা পিস্তল। পা না ঠুকে হাঁটতে চেষ্টা করলেও ওদের জুতোর শব্দ হয়।··· ওর শরীরটা সোজা··· লিকলিকে··· সাপের ছোবল মারার মতো হাঁটার ধরণ··· বাঁ হাতটা অসাড় হয়ে ঝুলছে। ডান হাতটা পকেটে ঢোকানো। আলো আর ভিড়··· অনেক লোক হয়েছে মাইকের শব্দ। ক্লাচ··· টর্চের বোতামের মতো সেফটি ক্যাচটা সামনে এগিয়ে যায়।

মার্কারি আর টিউবে রাত দিন হয়ে গেছে। গিজগিজ করছে লোক। বেঁটে একটা টাকমাথা লোক এতক্ষণ কমিক করছিল—ছেলে পাশের বাড়ির মেয়েকে হিড়িক দেবার জন্যে বাপের আক্ষেপ। লোকেরা হেসে হেসে ঘেমে গেছে কারণ ছেলে শেরে দিকে বাপের পেটে পেটো চমকাব বলে লাফাচ্ছিল। সলজ্জ মেয়েদের দিকে চোখ মেরে যাচ্ছে ছেলেরা এবং প্রতিটি ছেলেই অন্য ছেলেদের দিকে হিংস্র চোখে নজর রাখছে এবং সরফরাজি করছে। মাইকে কিঁ··· ই··· ই করে একটা যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছিল শব্দটা থামিয়ে ঘোষণা শোনা যায়—"এবার আপনাদের সামনে সংগীত পরিবেশন করছেন শ্রীঅজিত কাপুর ও সম্প্রদায়। বঙ্গোয় সহযোগিতা করছেন মাস্টার লিমবো, পিয়ানো একর্ডিয়ানে গণেশ মোদক, গিটারে পিনাকী বোস।" চুঁই চুঁই সিটির আওয়াজ শোনা যায়। লোকেরা উঁচু হয়ে স্টেজের ওপর দেখতে চেষ্টা করে। বাজিয়েরা বাজনা সাজায়, মাইকওলা এসে মাইক্রোফোন ঠিক করে। ঘোষক এবার বেশ নাটকীয় করে গলা চড়িয়ে চেঁচায় "অজিত কাপুর অ্যান্ড হিজ পার্টি।" অনেকটা জায়গা নিয়ে উৎসবের আয়োজন—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওপরে সামিয়ানা। ঘেরার দুদিকেই লোক জমাট হয়ে আছে। অজিত কাপুর একহাতে মাইক্রোফোনের গলা ধরে··· লোকের গুঞ্জন কমে আসছে··· হঠাৎ বাঁশের বেড়ার ওপর উঠে একটা ছেলে চিৎকার করে ওঠে—"হরে কৃষ্ণ হরে রাম!"—ছেলেটার সারা মুখে ব্রণ— কতকগুলো সিটির শব্দ শোনা যায়—সেই সঙ্গে "গুরু! গুরু!" চিৎকার। ছেলেটার চিল্লোনো আবদার বোধহয় গায়কের কানে পৌঁছয় না। সে ঘাড় অবধি নেমে আসা চুল ঝাঁপিয়ে বলে—"হামারা পহেলা গানা হায় ফিল্ম আঁখমিচৌলিসে।"··· আবার কতকগুলো সিটির শব্দ আর উল্লাসধ্বনি (এই সময় ও ভিড়ের মধ্যে ঢুকছিল আর একটা নিরীহ চেহারার লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে সে ফিসফিস করে দাঁতের তলায় বলেছিল—"স্টেজের সামনে, ডানদিকে··· ")—পিয়ানো একর্ডিয়ানটা বেজে ওঠে গিটারে ভ্যাম্প শুরু হয়, বঙ্গোটা টিগ ডিগ্ করে বাজতে থাকে— লাল গুরু শার্ট পরা গায়ক একটু পেছনে হেলে মাথাটা সামনে ছুঁড়ে দেয় সহসা এবং উৎকণ্ঠায় কাতর ছেলেরা মুগ্ধ চোখে দেখে তিনটে ভ্যাম্পের মাথায় একটা হাত কানের ওপর চাপা দেয় গায়ক—চোখ বুজলে কার হিম্মত আছে বলবে যে কিশোরকুমার না···

··· আজা রে আজা—ছুপ ছুপকে পেয়ার হাম করেঙ্গে
বাত য়ে কিসি কো মালুম হো না পায়ে
আজা রে আজা···

(পিঠটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, আলোগুলো গলছে, সিটির শব্দ আর ভিড় ঠেলে ও এগোয়, ওর চোখ প্রত্যেকটা মুখে তাকায়, লোক সরিয়ে ও এগিয়ে যায়, উঁচু হয়ে দেখে,

সামনের দিকে চেয়ারে মেয়েরা বসে আছে, তার ডানদিকটা যদিও এখান থেকে একটু দূরে তবু ওখানে··· 'স্টেজের সামনে, ডানদিকে'···) ··· যে ছেলেটা চিৎকার করে ফিল্মের নাম বলেছিল সে তার ক্যাওড়াদের নিয়ে ভিড়ের মধ্যে একটু গোল জায়গা খালি করে নিয়ে নাচছে। রুমাল দিয়ে ঘোমটা বানিয়ে সরাচ্ছে আর ঢেকে দিচ্ছে। খ্যামটার তালে তাল মিলিয়ে হাততালি দিচ্ছে অন্যরা··· কোমর নাচাবার ভঙ্গিতে যৌনমিলনের প্রস্তাব অত্যন্ত স্পষ্ট···

··· কিওনা আচ্ছা হায় এ মৌকা
দুনিয়া ভি হো জায়ে ধোকা
জঙ্গল মে জঙ্গল মনায়েঙ্গে হাম
মোহব্বত কী কিসমৎ জগায়েঙ্গে হাম···

··· মেয়েরা অবাকবিভোর হয়ে শুনছে কারণ কিছু কিছু গান হরমোনকে সম্মোহিত করে, যৌবন থাকুক বা না থাকুক দেহলিতে অহিফেন-মাদকতা আনে। পিয়ানো একর্ডিয়নের রিডে ছোকরার আঙুলগুলো দুর্দান্ত খেলা করছিল তখন, বঙ্গোবাদকের চুল তার কপালের ওপর এসে পড়েছিল, সে ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দেয়। দারুণ জমে গেছে গান, সমস্ত ভিড়টা বুঁদ হয়ে শুনছে (গৌতম বিশ্বাস নীল শার্ট আর পায়জামা পরা··· ফরশা, গানটা শুনছিল না অন্যমনস্ক হয়ে ছিল জানবার কোনো উপায়ই নেই··· ও একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ায়—একটা লোকের পরেই··· অজান্তে ডানহাতটা পকেট থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে রিভলভারটা নিয়ে··· নলের মুখটা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখায় কেউ দেখতে··· ছেলেটা ফরশা··· রুক্ষ চুল··· মুখের মধ্যে একটা মজা পাবার ভাব আছে··· চোখদুটো বড় সুন্দর··· এস ও, এস··· মাত্র একটা লোকের পরেই—ক্যাওড়াদের নাচের হাততালির শব্দ···

··· চুলকুনিটা দপ দপ করে লাফায়, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে··· মুখের মধ্যে থুথুর ঘূর্ণি··· চোখদুটো ঠাণ্ডা··· মরা শকুনের চোখ··· ট্রিগারের ওপর কালচে নখওলা আঙুল জুড়িয়ে আছে··· সাপ··· জিভ ধারালো ভাঙা দাঁতে লেগে চিরে যাবার মতো তীব্র একটা মুহূর্তে···

··· আজা রে আজা—ছুপছুপকে···

··· ও সোজা হয়ে দাঁড়ায়··· সমস্ত আলোর বাল্বগুলো সহসা ঝলসে যায় ছোবলে··· গলা আলোয় নেগেটিভ ছবির লোকটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে ও সামনে এসে দাঁড়ায়··· মোটা লোকটাকে সরিয়ে ও সামনে এসে দাঁড়ায়··· মোটা ঠোঁটটা সরিয়ে লালা পড়ছে—বাল্বগুলো গলে টল টল করে তরল আলো পড়ছে··· রিভলভারটা প্রায় পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানে··· ব্লব্··· ছেলেটার বিস্ফারিত চোখ··· সাইলেন্সারে গুম হয়ে যাওয়া আওয়াজ··· ওয়াক্ ছেলেটার পেট থেকে রিক্ত ছিটকোয়··· মুখটা হাঁ করা বাতাস উগরোয় হাঁটু ভেঙে সামনে এগিয়ে আসে··· চোখদুটো সহসা আঘাতে বিস্ময়ে বোবা··· ওর মুখ থেকে লালা পড়ছে··· ছেলেটা যেন ওকে ছুঁতে আসে··· না পেরে উলটে হাঁটু গেড়ে শরীরটা পড়ে··· ও এক পা সরে আসে তারপর খুলির নীচে গলায় রিভলভারের মুখটা ঠেকিয়ে গুলি করে ব্লব্ শরীরটা ছিটকে যায়··· লালা টানার অশ্লীল শব্দ··· হাতদুটো একটু কাঁপে চারপাশে চিৎকার··· ফিকে একটু কর্ডাইট আর রক্তের গন্ধ··· আলোগুলো দুলছে··· লোক দৌড়য়··· চিৎকার··· সমস্ত আলোগুলো থেকে একটা জ্বলন্ত গোলক তৈরি করেছিল··· টগবগ করতে করতে আলোগুলো আলাদা হয়ে ফিরে যায়··· শব্দ···

কানের ওপর টিকটিকিটার শিকার আছড়ানোর শব্দ··· রক্ত মেখে ওলটপালট করে··· লোকের পায়ে জড়িয়ে যায়··· মুখটা মাটিতে ঘষে—হাঁতটা টানটান হয়··· থেমে যায়··· পায়ের কাছে রক্তাক্ত একটা দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে—

··· একটা বুড়োর জুতোয় রক্ত ছিটকে লেগেছে, বুড়োটা পেচ্ছাব করে ফেলেছে। একটা মেয়ে দাঁতে দাঁত লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কতকগুলো মেয়ে আর বাচ্চা কাঁদছে। লোকজন দৌড়বার ভিড়ে প্লেনড্রেস দুজন এগোতে পারছে না। কয়েকটা লোক (পুলিশের লোক) চেঁচাচ্ছে—"দৌড়বেন না, দাঁড়ান··· দৌড়বেন না।" সাইলেন্সারের শব্দ (চুরি করে হত্যার অস্ত্র) বেশি দূরে যায় না তবু খুনের খবর চলে গেছে—সবার কাছে। যুবক সমিতির কিছু ছেলে সন্ত্রস্ত মুখে হন্তদন্ত হয়ে লোক আটকাচ্ছে। গায়ক ও তার দলবল স্টেজে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন নড়বার সাহসটুকুও নেই··· "দৌড়বেন না, দৌড়বেন না—যে যেখানে আছেন দাঁড়িয়ে যান—কিছু হয়নি।" পুলিশের একজন লোক অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জটলার দিকে যায়। (সেই লোকটা যে ওকে গৌতম কোথায় আছে বলে দিয়েছিল)··· ওরা বলাবলি করছিল এরকম একটা ব্যাপারের পর জলসা থামিয়ে দেওয়াই উচিত কারণ গৌতম পাশের পাড়ার ছেলে আর মাংসরক্তের দৃশ্য দেখে সকলেরই যখন গা গুলোচ্ছে। পুলিশের লোকটা কিছুটা অর্ডারের মতো করে চিল্লায়—"শুরু করতে বলুন—জলসা ফলসা থামানো চলবে না, গান হোক, গান চলুক—আমরা লাশ বার করে নিয়ে যাচ্ছি—শুরু করতে বলুন।" স্টেজের দিকে পিস্তল নাটিয়ে লোকটা আর্কেস্ট্রার কন্ডাকটরের মতো করে চেঁচায়—"অ্যানাউন্স করতে বলুন—" —মাইকে ঘোষণা শুরু হয় "আমাদের সংগীতানুষ্ঠান আবার শুরু হচ্ছে—আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন—ভয় পাবেন না—ভয় পাবার কোনো কারণ নেই"—গলাটা একটু কেঁপে যায়। যে বলছে তার কথা আটকে যাচ্ছে।

···মৃত্যুর ভারী বাতাস প্রত্যেকটা লোককে ছুঁয়ে গেছে। কয়েকজন হাত তুলে আছে। (ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই) ও সামনে যায়, হাতে খোলা রিভলভার। লোকে দুধারে সরে যায় আর আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকে। দুজন প্লেনড্রেস ছেলেটাকে নিয়ে চলে ওর পরে। একজন একটা হাত, আর একজন একটা পা ধরে ছেলেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—রক্তাক্ত গলার পর অসহায় মাথাটা ঝুলছে—চোখটা খোলা—ওদের চলার ধরণে মাথাটা যেন এই বহুদৃষ্ট যাত্রার প্রতি গভীর সম্মতিতে দুলছে। রক্ত ছড়িয়ে গেছে সারা জামা। মুখটা খোলা, কিছুটা বিস্ময় এখনো মুখ থেকে যায়নি। মাটির ওপর আছড়ে পড়েছিল বলে কপালটা ছড়া, মুখে মাটি ঘষে গেছে—রক্ত গলা থেকে গড়িয়ে গিয়ে কানের পাশ দিয়ে চুলে গিয়ে জমছে, মাটিতে পড়ছে (ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই)—ডান পা মাটিতে ছেঁচড়ে চলে, হাতের আঙুলগুলো টেনে টেনে মাটিতে দাগ কাটতে চেষ্টা করে যেন। লাশের পেছনে পিস্তল নিয়ে সেই লোকটা। মাইকের যান্ত্রিক শব্দটা আবার শুরু হয়—সেটাকে ছাপিয়ে পিয়ানো একর্ডিয়ানের দু-একটা সুর শোনা যায় যে জায়গাটায় ছেলেটা পড়েছিল সেখানে রক্ত থেকে জমাট বেঁধে আছে—ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়িয়ে আছে—ছিটকে ছিটকে গেছে—এক পাটি চটি উলটে পড়ে থাকে—কে একজন বলে চুন এনে ছড়িয়ে দিতে—শুষে নেবে—(ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।)

(কখনো দাঁড় করিয়ে খুলির পেছনে নল লাগিয়ে বুলেটে মাথা চৌচির করে ঘিলু ছিটকে দেওয়া হয়েছে, কখনো অ্যাসিড ও নুন মাখিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে,

জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, চলন্ত গাড়ির থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে যাতে রাত্রের শেয়ালরা অভুক্ত না থাকে—এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কলকাতার কোনো কুকুর মানুষের মাংসের স্বাদ পায়নি একথা জোর দিয়ে বলা যায় না—জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—পচে ফুলে রবারের মতো হয়ে যাবার পর শনাক্তকরণ অসম্ভব এবং বিভিন্ন উচ্চতা থেকে আছড়ানো হয়েছে, লাঠি পিটিয়ে কিমা করে ফেলা হয়েছে···এবং আরো দেশী বিদেশী যন্ত্র··· রসায়ন··· বিকৃতি··· যা যা করা সম্ভব হয়নি তার মধ্যে নাৎসি ফ্রিজিং মিক্সচার ও গ্যাসচেম্বার বা মার্কিন পদ্ধতিতে উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেবার কথা বলা যায়)

ভয় পাবেন না, ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

ঢাউস ভ্যানটা এগিয়ে এসেছিল। দরজার দুটো পাল্লা হাঁ হয়ে আছে। ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লাশ ওঠাতে বলে··· হাতটা ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে একজন ভ্যানের মধ্যে ঢুকে যায়··· মাথাটা একবার ঠুকে যায় পা-দানিতে—পাগুলো বাইরে বেরিয়েছিল··· ভেতর থেকে টানার ফলে অন্ধকারে ঢুকে যায় মৃতদেহ। একপায় চটি ছিল না। খুন! লাশচুরি! সারাটা রাস্তা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত! রক্ত মৃতদেহ··· রক্ত কিন্তু এখন আর পুলিশের কুকুর এসে নাক কুঁচকে শুঁকে শুঁকে খুনিকে হদিস করবে না। আজা রে আজা, ছুপছুপকে··· কলজে নিঙড়ে নিচ্ছে গুরু! একটা দায়সারা ময়নাতদন্ত··· ওয়াক্··· কাঁটাপুকুর মর্গের প্রাত্যহিক মোচ্ছব··· রাত্তিরে শ্মশানের সামনে লাশ পাচারের ভ্যান··· ঘুমচোখে অভ্যস্ত ডোম··· ইলেকট্রিক চুল্লির তীব্র লাল কয়েলের ফার্নেসে নিক্ষিপ্ত নগ্ন দেবদূত··· দপ্ করে জ্বলে ওঠা চুল ও কাপড় সমস্ত লোক সাক্ষী, সচক্ষে দেখা সমস্ত ঘটনা··· কিন্তু এবার আর কেউ সাক্ষী দেবে না কেন? কবন্ধ কখনো কথা বলে কে কোথায় শুনেছে?··· থানায় মুখ দেখিয়ে গৌতম চলে যাবে মর্গে··· সেখানে সারারাত একলা··· মুখটা একটু খোলা··· বিস্ময়ে চোখ চেয়ে?··· ঠাণ্ডা··· শক্ত··· আড়ষ্ট রাত্রে বাড়িতে খবর যাবে··· গৌতমের বুড়ো বাবা তস্কর কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হয়ে বালিশের পাশে হাতড়ে চশমা খুঁজবেন··· কে··· খুলুন, হরেন বিশ্বাস কার নাম··· বৃদ্ধের ভীত মুখের ওপর টর্চের আলো পড়বে··· রাত্রিকে তছনছ করে দেবে ভয়··· বুটের শব্দ··· বলা হবে জরুরি প্রয়োজনে আসতে··· চরম আশঙ্কাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করবে সবাই··· কত কি হতে পারে··· মৃত্যু ছাড়া আর সমস্ত কিছু এখন অস্বাভাবিক··· লাশ দেওয়া হবে কি হবে না··· আর এক উল্লাস··· গৌতম এতকিছুর এতটুকুও জানতে পারবে না··· সারাটা রাত একটা স্বল্পালোকিত হিমঘরে একা শুয়ে থাকা শক্ত ঠাণ্ডা আড়ষ্ট··· স্মৃতিফলক হাড়িকাঠ গলগোথা··· জায়গাটায় রক্ত জমাট হয়ে আছে··· মৃগয়ার শিকার ঝুলিয়ে নিয়ে আসার সারাটা পথে রক্তের শুকনো দাগ সমস্ত বাতাস রক্তে ভেজা··· কোনো 'বিচার বিভাগীয় তদন্ত' এই হত্যার জন্য হাস্যকৌতুকের আসর হাঁকিয়ে বসবে না··· গৌতম যে কোনো একটা রেপকেস বা ওয়াগনতোড়ের চেয়ে বেশি ইজ্জৎ আশা করতে পারে না। রক্ত শুকিয়ে মাটি হয়ে যাবে··· রক্তের গন্ধ নিশ্বাস হয়ে মানুষের বুকে মিশে থাকবে··· রক্ত খুন রক্ত মৃতদেহ রক্ত কিন্তু এবার আর লাল-বাজারের ডালকুত্তা এসে শুঁকে শুঁকে খুনের হদিশ বের করবে না··· কেন?

হেডলাইট দুটো গেস্টাপোর চোখের মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। গাড়িটা জোরে চলছিল তবে এবার ব্যস্ততা অনেক কম। ও মাঝে মাঝে পা দিয়ে লাশটা ছুঁয়ে দেখছিল আর সিগারেট খাচ্ছিল চোখ বুজে। চুলকুনিটা কমে যাবার পর কমজোর লাগছে। মাথাটা

খালি খালি, ভ্যান চলার ঝাঁকুনিতে লাশটা লাফায়, নড়াচড়া করে। (সত্তরের দশকের প্রথম দিকে গৌতমের মার প্যারালিটিক হয়ে যাবার কারণ কি হিজড়ের ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকতে গৌতমের অস্বীকার করা? প্রোটিনের অভাব? দুর্ঘটনা? গৌতম, "বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে দু রাউন্ড গুলি চালাতে হয়,"—এই খবর কালকে লাখ লাখ লোক পড়তে চলেছে—এ বিষয়ে তুমি কি করতে পারো? বিশাল রোটারি মেশিন থামিয়ে দেবে? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা? তোমার এই ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকানোর মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট কোনো নির্দেশ নেই।) একটা পা শুধু ভাঁজ হয়ে আছে। ও লাশটার ওপর ছাই ফেলে আর গুন গুন করে একটা সুর ভাঁজে। সিগারেটের ধোঁয়াটা মগজে ধাক্কা দেয়। আলোগুলো কিলবিল করছে মুখের ওপর—একটা প্রাইভেট সামনে রাস্তা দিচ্ছিল না—"আরে মাদার" ড্রাইভার কাঁচা খিস্তি করে—ও হাসে। পকেটে সিগারেটের শুকনো গুঁড়ো, বদ্ধ ঘাম আর যৌনতার গন্ধের মধ্যে রিভলভারের ভারী বোধ। চুলকুনিটা প্রায় নেই। ঘামের টক গন্ধটা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে না রক্তের গন্ধটা বাড়ছে? রাস্তার আলো ওর তেলা কপাল আর চোয়াড়ে গালের ওপর কাঁপছে—ফাসিস্ত আদলের মধ্যে প্রাকৃত এক অশিক্ষিত মুখ। ও ঝিমুনির মধ্যে পা দিয়ে লাশটাকে ছোঁয়—এখনো মানুষের মতো, ঘণ্টা দুয়েক পরে কাঠমড়া হতে শুরু করবে।—"সিটো শালা সিটো।" (বিসর্জনের রাতে ভাসানের ঢাক বাজে না, মানুষ বিগ্রহকে ভুলে থাকতে চায়, তাসা পিটিয়ে ছেলেরা নাচে না। মুখ থেকে ফুঁ দিয়ে পেট্রল জ্বালায় না—এ কেমন আনন্দ? গৌতম, মর্গের ইঁদুরগুলো ও রকম স্বাস্থ্যবান আর মাংসল কি করে হয়? গৌতম! তোমাকে চেরাই করে ওরা কিসের তালাশ করবে? তুমি কোন পূজার অঞ্জলি? তোমার ভয় করে না?) পেট্রলপোড়া কালো ধোঁয়া নাকে আসে। জোর একটা ঝাঁকুনি দেয় ভ্যানটা। সিগারেটটা ঠোঁটে ঠেকান যায় না। লাশটা হুড়ুদ্দুম লাফায়। থানার গেট দিয়ে গাড়িটা ঢুকছে। গর্ গর্ শব্দ করে ইঞ্জিনটা দমে আসে—হেডলাইটের আলোদুটো নিভে যায়।

কালো আর একটা ভ্যান, গায়ে শাদা ক্রশচিহ্ন। দুটো খাকি জামা পরা নড়বড়ে আধবুড়ো লোক আছে। ওরা গৌতমকে বয়ে নিয়ে যাবে ওই ভ্যানটায়—যাতে চড়ে ও চলে যাবে মর্গে। গাড়িটার নাম এম্বুলেন্স ভ্যান হলেও ওতে আহতদের চেয়ে নিহতেরাই বেশি চড়তে পায়। আয়োডোফর্মের গন্ধ··· ফাঁড়াই··· সেলাই ইঁদুর দৌড়বার শব্দ··· গৌতম, তোমার ভয় করবে না?

বেল্টটা ঢিলে করতে করতে ও ঢুকছিল। ওসি-র ঘরে গিয়ে রিপোর্টটা দেয়···

—কোন রেসিসট্যান্স দিয়েছিল নাকি?

—না স্যার টাইম পায়নি।

বেরোতে বেরোতে প্রশ্ন আসে—"ক রাউন্ড?"—"দু রাউন্ড স্যার।" (এক রাউন্ডেই ফেলা যেত কিন্তু হাতটায় খুন ভর করলে আঙুলগুলো থামতে চায় না।) ঘরে ঢুকতে শোনে দাসের টেবিলে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে। যদিও কেউ ঘরে নেই। দাস একটু বাদে এসে ঢুকলো। জেনানা লক-আপ থেকে হাসির শব্দ আসে। ও কান খাড়া করে শোনে। দাস বকতে থাকে—"দ্যাহেন একবার কাণ্ডকারখানা—কতকগুলো ছেমড়িরে ধইরা আনছে। আপনেও ডিউটিতে গ্যালেন—ওই গুলারে লইয়া আসল। আনবি তো আন—আমারই কাছে। বাব্বাঃ—কি মুখ এক একটার। এক্কেরে সেরদর··· কথা কয় আর হাসে··· কথা কয় আর হাসে··· আউ ছিঃ ছিঃ। এস আই মল্লিক ঘরে এসেছিল। দাস

বলে··· "ও মশাই—দুপুরে ওই যে প্রফেসার না কি ছাতা আসছিল··· কি একটা কথা বার বার বলছিল বলেন তো?" মল্লিক বুঝতে পারে না—বলে "কি কথা?"—"আরে, ওই যে সব চোর বাটপারের কথা—খোঁচোর, গজ—আরো কত কি।" মল্লিক একটু হেসে বলে—"স্ল্যাং স্ল্যাং—উনি একটা আন্ডারওয়ার্লড স্ল্যাঙের ডিক্সনারি লিখছেন।" দাস খুব খুশি—"অয়, অয়—স্লেং এইবার ধরছি—স্লেং কালেক্ট করে।—স্লেং···।" দাস বড় মজায় হাসে আর মাথা দোলায়। মেয়েগুলোও লক-আপে খিল খিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে এ ওর গায় ঢলে পড়ছে। ও হাসির শব্দটা মন দিয়ে শোনে। বেশ লাগে শুনতে। পাউডার আর দোক্তার গন্ধ, চওড়া চওড়া, কালোকালো; মোটামোটা ঠোঁট—মাথায় চওড়া নাইলনের রিবন।—"শালা! লুড়কুৎগুলোকে মেরে মেরে হাত পচে গেল।" উঠে পেচ্ছাব খানার দিকে গেল।

(অপরকে বিনষ্ট করিবার অধিকারবোধ আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিবার ইচ্ছার অভেদস্বরূপ নিজের দেহে, রক্তকণিকায়, চৈতন্য ও স্নায়ুতে মৃত্যু ভীতির রূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং এই প্রজন্মের নৈরাজ্য দেহকে অতিমাত্রায় জাগ্রত ও হীনবল এবং মনকে সাবধান ও পক্ষপাতগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই বিপরীতমুখী ক্ষয়প্রবাহের মধ্যে নেতি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায় এবং নিজের সংরক্ষণের ইচ্ছাকে ক্লান্ত ও মন্থর করিয়া তোলে ফলে প্রতিটি হত্যাই নিজের মধ্যে মৃত্যুর অনুঘটক হইয়া কাজ করে ফলে মহামারীর লক্ষ লক্ষ মাছির পাখনার উল্লাস রক্তে ধ্বনিত হয়।)

দরজার কাছের সিটে ও ঘাড় গুঁজে বসেছিল আর ডানদিক বাঁদিক দুলছিল। রিলিফ ভ্যানে রাত করে ফেরবার সময় ঝাঁকুনিতে ওর ঘুম পাচ্ছিল—শুধু মধ্যে মধ্যে পা-টার সামনে এগিয়ে কি একটা খোঁজার অভ্যাস হয়ে গেছে তাই ঝিমুনিটা বার বার চলে যায়। রাত্তিরে সাবান মেখে স্নান করে—চুলকুনিটায় মলম লাগায়—শরীরের ঘাম আর নোংরা ফেনা কলতলার ঝাঁঝরির কাছে গিয়ে পাক খেয়ে তলিয়ে যায়। মাথায় গন্ধতেল মাখে। খুব ঘুম পায় কিন্তু ঘুম কখনো স্বপ্ন ছাড়া আসে না। স্বপ্নের চোখ আছে, তারা প্রশ্ন করে, হাসে, টিন বাজায়, স্বপ্নগুলোর হাত পা ছেঁড়া, টুকরো টুকরো, রক্তাক্ত। যদিও কম কথা বলে কিন্তু বাড়ির লোক বলে ও নাকি ঘুমের মধ্যে কথা বলে ওঠে, কখন গোঙায়, জড়িয়ে জড়িয়ে অর্ডার দেয়। কোনো কোনোদিন ঘুমের মধ্যে পিঠটা এত আঁচড়ে আঁচড়ে চুলকোয় যে সকালে দেখে কেটে গেছে। আগে ভাবত ভূতে খিমচোয়। চুলকুনিটা তারপর সারাটা দিন জ্বালা করে আর ডানহাতটা ছটফট কর। পাশের লোকটাও ঢুলছে। কেউ একজন বিড়ি খাচ্ছে—আগুনটা দপ করে ওঠে। ঝিমুনিতে মাথাটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে··· কানের মধ্যে শুধু গাড়ি চলার শব্দ··· বাঁ-পাটা সামনে এগিয়ে যায়। আলো যা জ্বলছে রাস্তায়··· অনেক বাড়ির আলো নিভে গেছে। পানের দোকানের সামনে দু-একটা লোক। ট্রামের শ্রমিকরা রাত্তিতে ট্রামলাইন খুঁড়ে কাজ করছে। লাল লাল লণ্ঠন ঢিবি করা কালো মাটির ওপর সার দিয়ে রাখা। ও ঝিমোয় তাই দেখতে পায় না। অন্ধকার সিনেমা হল—নায়িকার বিশাল ছবি—ঠোঁটের কাছটা খোবলানো। রাস্তাঘাট ফাঁকা—শেষ কয়েকটা ট্যাক্সি জোরে বাতাস উড়িয়ে চলে যায় এদিক-ওদিক। ডিউটি শেষ করে প্রাইভেট বাস আলো নিভিয়ে গ্যারেজে ফিরছে। বাঁ হাতে টিফিন বাক্সটা ধরে ও ঝিমোয় কিন্তু প্রখর এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে দেয় এখন কোন রাস্তা চলছে। প্রত্যেকটা মোড় চেনা—তাকালেই চেনা জায়গা দেখা যায়। ওর

নিজের অঞ্চলটা শান্ত। ভ্যান থেকে বাড়ির গলিটার মুখে নামিয়ে দেয় রোজ আবার সকালে ওখান থেকে তুলে নেয়। ওর পাড়ার কোন ঝুট ঝামেলা নেই, দেওয়ালে কিছু লেখা আছে বটে কিন্তু ওগুলো বে-পাড়ার ছেলেদের কাজ। ও ভালো করেই জানে যে ওর পাড়ার কোনো ছেলে এসব করে না। এইসব কথাগুলো ও রোজ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ি ফেরবার সময় খতিয়ে ভাবে। প্রত্যেকটা কথা বোঝে, ওজন করে তবু ভয় যায় না। পুরোপুরি আশ্বস্ত হবার কোনো কারণ নেই কারণ সুধীর বোস ওই এক থানাতেই এস-আই ছিল। তারও পাড়ায় কোনো গণ্ডগোল ছিল না, কিন্তু একদম বাড়ির চৌকাঠের সামনে কুপিয়ে দিয়ে গেল···ডান হাতটা প্যান্টের ওপর দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে রিভলভারটা খোঁজ। অবশ্য সুধীরের কতগুলো অসুবিধেও ছিল—মোটার দিকে গড়ন থাকার জন্যে হাত-পা বেশ তাড়াতাড়ি খেলত না। ফাঁক পেলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টেরি কাটত। লোকটা নাকি ঝুলেপড়া নাড়িভুঁড়ি ধরে ছুটেছিল হাত বিশেক। বউ আর দুটো বাচ্চা। সুধীরকে যেদিন ভ্যানের পর ভ্যানের মিছিল করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন ও ছিল। ভালো করে দেখছিল মুখটায় কিছু হয়নি পেটটা ফেঁড়ে দিয়েছিল—তক্ষুনি তক্ষুনি মরেওনি, নল নাকে ঢুকিয়ে বেঁচেছিল দিন দুয়েক। গাড়িটা থামবার আগে ও টিফিন বাক্সটা বাঁ পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। রিভলভারটা ডান পকেট থেকে বার করে—বেশ ভারী— ম্যাগাজিনটা দেখে—সেফটিটা সরিয়ে আবার ট্রিগারে আঙুল রেখে পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখে। গাড়িটা থামে।

ইঞ্জিনটা চলছে বলে একটানা গোঁ গোঁ শব্দ হয়। দরজাটা খুলে লাফ দিয়ে নামে। দরজাটা ঠেলে দেয়। গাড়িটা চলে যায়। ছোট লাল আলোটা শব্দের সঙ্গে দূরে চলে যায়। সামনে পেছনে দেখে। কেউ নেই, ফাঁকা। চাঁদের অসুস্থ পাণ্ডুর আলো। কোনো বাড়িতে আলো জ্বলছে না। দূরে ভ্যানের শব্দটা মিলিয়ে যেতে নিস্তব্ধতা জড়ো হয়ে আসে। ঠাণ্ডা বাতাস আছে। ও গলির মোড়টা ঘোরে বেশ সরু রাস্তা—ভ্যান ঢুকতে পারে না। বাঁদিকের ইটের পাচিলটা ওর হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পেছনদিকে সরে যায়। পাঁচিলের ওপর সারি দিয়ে লাগানো কাচের ধারালো টুকরো চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে। শুধু ওর চলার শব্দ। চাঁদের থেকে কিছুটা দূরে একটু মেঘ, একটু দূরে ল্যাম্পপোস্ট··· চকিতে দাঁড়ায়··· নিজের চলার শব্দ নেই··· রিভলভারটা নিয়ে থাবাটা পিছলে বেরিয়ে আসে পকেট থেকে··· খস্ খস্ শব্দটা ওকে ছুঁতে আসে···

··· ল্যাম্পপোস্টটা হঠাৎ খিলখিল করে গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। উলটোদিকে ইটের দাঁত বার করা হাড়গিলে পাঁচিলটা হা হা করে হাসে, ফাটলের মধ্যে চোখ··· চোখের পাতা ছেঁড়া, হাইড্রেন্টের খোলা চোয়ালের মধ্যে কারা যেন কান পেতে শোনে··· বদলার একটা ছুরি চিৎকার করে ছিটকে যায়। ঝলসে ওঠে ফলা! পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ আলো পাইপগানের উগরোন গলা এক টুকরো সিসে হয়ে ছুটে আসে!—ও রিভলভারটা হাতে নিয়ে সাপের মতো চারদিকে তাকায়— দেওয়াল আর মিশকালো শ্যাওলা, নিঃশব্দ রাত তবু হলুদ চাঁদটা ছাদের আলসে থেকে গড়িয়ে রাস্তায় আছড়ে পড়ে বার বার অসংখ্য স্প্লিন্টারে ফেটে যাচ্ছে, শরীরের মধ্যে মাংসরক্তের মধ্যে হাড়ের মধ্যে মজ্জা ভয়ে জমে আছে—ভয়! মৃত্যুভয় তারা খসে পড়ার পর ভয়াবহ অন্ধকার বাতাসে শব্দহীন ঘাতক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে পায়ের শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী প্রতিশোধ—খালি পায়ে দৌড়বার শব্দ··· স্ট্যাবকেস··· হালাল··· নীল শার্ট আর পায়জামা পরা মুখে রুমাল বাঁধা··· গায়ে চাদর জড়িয়ে বোমা ধরে রাখার বিশেষ

হাতের নিশানা··· "আমরা নেবোই নেবো" বদলার শব্দ মর্গের ভ্যাপসা আলোয়··· শ্মশানে ও প্রান্তরে··· প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি বাড়ি খেয়ে খেয়ে ফেরে··· রক্তহীন মুখ যুবকের··· ড্যাগার··· রক্তমাখা নীল শার্ট পরা··· শরীরে বুলেটের গর্তগুলো জ্বলছে নিভছে জ্বলছে···

—ও হাঁপায় আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে—ভয়ে সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে যায় নিশ্বাস, ব্লাডগ্রুপ, লালা, আইডেনটিটি-কার্ড, টিপছাপ, হাসি, রিভলভার, পাসপোর্ট সাইজ ফটো, নিম্ন বুদ্ধাঙ্ক, হজম, উল্লাস, ভোগ্যনারী, চেতনা, দেশ, রাশিচক্র—নাপাম জেলির মতো স্বচ্ছ, গাঢ়, বীভৎস—তার সমগ্র অস্তিত্ব ভীত কৃমির মত কুচকে যায়···

খস্ খস্ শব্দ। চারদিকে তাকায়—কেউ নেই। খস্ খস্ শব্দ। একটা ভোটের পুরোনো পোস্টার আলগা হয়ে ঝুলছে আর বাতাসে দেওয়ালের গায় ঘষছে—খস্ খস্ শব্দ।

সমস্ত শরীরটা টান টান হয়ে ওঠে আবার, শ্লথ ও তৃপ্ত মুখ। ও রিভলভারটা বাঁ হাতে নেয়, ডান হাতের তেলো ঘামে ভিজে গেছে, হাতটা প্যান্টে ঘষে, উত্তেজনায় মুখ থেকে লোল পড়েছিল। মুখটা হাত দিয়ে মোছে আর মোছবার সময় সেই বিশেষ ঘামের টক গন্ধটা পায়। খুন আর ভয়ের জৈব গন্ধ! ওর চলবার শব্দটা জোর হয়। আড় চোখে দেখে চাঁদটা আলশেতে ঠিক ঠেকে আছে। ঠোঁটদুটো সরিয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে হলুদ—ও হাসে। একটা বেড়াল দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে আঁশটে ছাইগাদা আর ময়লার মধ্যে চলে গেল। ও হাসে। চোখদুটো শুধু সজাগ আর জ্বলন্ত। ওর ছায়াটা রাস্তায় আর দেওয়ালে ভাগাভাগি হয়ে পড়েছে—বুকের মধ্যে দিয়ে নর্দমা। তেরছা কালো টিনে কর্পোরশনের নোটিশ—"এখানে প্রস্রাব করিয়ো"—"না" টা ইট দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিয়েছে। বমি ওলটানো দুর্গন্ধ! কতকগুলো পোকা রাস্তার আলোর পাশে উড়ছে—ওর পা ফেলার শব্দ তারা শুনতে পায় না। বাড়িগুলো অন্ধকারে বিশাল বিশাল জন্তুর মতো ওত পেতে আছে। অস্বস্তিতে দাঁতগুলো হাসি থামিয়ে আবার ঠোঁটের আড়ালে চলে যায়। মুখের মধ্যে লালা জমে। চাঁদের আলো থিকথিক করছে, বিরক্তিতে হাতের আঙুলগুলো বেঁকে যায়। টক ইচ্ছেটা আঙুল বেয়ে কালচে থ্যাবড়া নখে গিয়ে জমে। শার্টের কলার শেষ হবার পরে ঘাড় আর পিঠের মাঝামাঝি জায়গাটা চুলকোয়?

১৯৭১

প্রতিবিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

আগামীকাল আমি আবার বুধগ্রহ থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছি। কলকাতায় ফিরে আসবার অভিজ্ঞতা এই আমার শেষ। এরপর থেকে আমি আর কলকাতায় ফিরব না। বুধগ্রহে থেকে যাব। সেখানে আমার একটা সেল আছে। যেখানে উঠে দাঁড়াতে গেলেই আকাশটা নেমে এসে পিঠের হাড়ে লাগে। অথবা অন্য কোনো শহরেও চলে যাওয়া যায়। ট্রেনে করে কলকাতায় ফিরে আসা এই আমার শেষ। আর কাউকে ফেলে আসি না বলে একা একা রাত্রির সবগুলো প্ল্যাটফর্ম ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসতে আমার খুব খারাপ লাগে। প্রথম দিকটায়, মানে সবুজ আলোর ধাক্কায় ট্রেনটা থামতে শুরু করলে আমার মনে হয় আমার আর খিদে পাবে না, ঘুমও আসবে না। কিন্তু একটু পরেই খিদে পায়। ট্রেনের জানালা খুলে একা একা যেতে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু অসম্ভব গম্ভীর মুখ করে খেতে থাকি। তারপর একসময় ঘুমিয়েও পড়ি। তখন আমাকে নিয়ে ট্রেন কলকাতার দিকে চলে।

ট্রেন ছুটে আসাতে অন্ধকার লাইনের দুধারে পালাতে গিয়ে সিগনালের তারে পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। বাতাস হা হা শব্দ করে গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরে। কয়েকটা হলদে রাতের আলো নিয়ে কুলি সান্টার ব্রেকম্যান ফায়ারম্যানের ঘুমন্ত ভাসমান লোকালয়, লাল লাল লাল আলোর সিগনাল, আকাশ, মাঠ, বিরাট ইয়ার্ডের পর পর লাইন, অনেক দূরের পাহাড়ে খনির পাথর ফাটানো শব্দ, বুকের মধ্যে ভারী ধাক্কা দিয়ে রেল পালটানোর আওয়াজ আচমকা পাশে এসে পড়া মালগাড়ি আর বাতিল লাইনের শেষে ঘাসজমাট বাফার—

—আমার পায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগে আর মাথার নীচে আধভিজে তোয়ালে জড়ো করা।

ঘুমের মধ্যে আমি সত্যি দেখতে পাই সবুজ বিপ্লবের পর বুধগ্রহে একটা কৃষকও নেই। সবাই মর্গের মধ্যে থাকে। অথচ মাঠ উঠোন সব গমে ভেসে যাচ্ছে। যে কজন কৃষক বাইরে ছাড়া তাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই। কোথায় তারা দাঁড়াবে যখন সব

জায়গায় গমগাছ? এত ফালতু গম নষ্ট না করে তাই আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঠিকই তো। আমেরিকায় লোকরা যখন খেতে পাচ্ছে না তখন বুধগ্রহ গমে ভেসে যাচ্ছে।···আমাকে নিয়ে ট্রেন কলকাতায় দিকে চলে। কিভাবে পৌঁছোব সেটা পরে বলছি। আমার এই ফিরে আসাটা একদিক দিয়ে ভালো। কারণ মধ্যে বেশ কিছুদিন আমি নিজের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করিনি। অন্তত বললে আমি বিশ্বাস করব। একটাও চিঠি লিখিনি, কেমন আছে একটুও ভাবিনি। তাই এবার দেখা হতেই প্রথমে আমি এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলাম যে পরে সব বলব। পরে সব আমি বলেছি। সবকিছু শোনার পর ও শুধু আমার হাতের ওপর হাত রেখেছিল। তার মানেই হল সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে।

সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে যদিও এটা হওয়াটাই অস্বাভাবিক। কারণ বাড়ি থেকে ডাকবার পর আমরা ছোট ব্রিজটার ধার অবধি একসঙ্গেই হেঁটে হেঁটে গিয়েছিলাম। যে জায়গাটায় কাঁকড়ার গর্ত আর কাদা সেখানে আমি আর আরেকজন চোখ মেরেছিলাম—তারপর ওই আরেকজন ওকে ঘাড়ের তলায় ধাক্কা দিয়েছিল। কাদার ওপর ও মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—তারপর উঠতে চেষ্টা করছিল। আমার প্রথম গুলিটা ওর কোমরে লাগে। কুঁকড়ে কনুই দিয়ে কাদা সরিয়ে সরিয়ে ও পালাতে চেষ্টা করছিল। ভাঙা শামুকের খোলে ওর গালটা ঘষে চিরে গিয়েছিল। পরের গুলিটা করেছিলাম নিজে কাদায় নেমে গিয়ে। মাথার সঙ্গে ঠেকিয়ে। তারপর আমি আর আরেকজন ওকে ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে জলের মধ্যে নিয়ে যাই। কোমর জলে গিয়ে ওর শরীরটা উপুড় হয়ে গেল। আমি রিভলভারটা পকেটে রেখে জলে হাত ধুয়েছিলাম। হাত ধোয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি ব্রিজের থামের গায় লেগে ও আটকে আছে। এবারে মুখটা আমাদের দিকে। আরেকজন দুটো থানইট নিয়ে ব্রিজের ওপরে উঠে গিয়ে ওর ওপর ফেলেছিল। ধাক্কায় ও থাম থেকে সরে যায়। তারপর একটু আড়াআড়ি ভাবে স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ও চলে.গেল। এতকিছুর পর একটা সমঝোতায় আসা যাবে আমি অন্তত এটা ভাবতে পেরেছিলাম। শেষ অবধি তাই হল। এখন আমি আর ও সমান সমান। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে এখন আমার পায়ের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আছে। নখের ওপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

···আমার ঘর সার্চ করাবার সময় এই ডায়েরি পাওয়া যায়···

৫-৩-৭৩ (মধ্যরাত্রি)

সম্ভবত সব শেষ হয়ে গেল। এখনো আমার প্রত্যেকটা কথায় আমার বিশ্বাস আছে। এর আগে প্রতিবারই আমি চুরমার হয়ে গেছি—স্বাভাবিক ভাবেই সেটা অবিশ্বাস ও আত্মহত্যার জটিল ইচ্ছার ঢেউ হয়ে আমাকে বিচলিত ও উন্মত্ত করে তুলেছে। আমার প্রাক্তন কার্যাবলী প্রায় ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের সঙ্গে তুলনীয়। কিছুটা আক্রোশ, কিছুটা অভিমান—ধস বা জাহাজডুবির মতো অনমনীয় ও হিংস্র। আশ্চর্যভাবে এখন আমি অনেক সংস্থিত! শব্দে আস্থা হারিয়ে বোবা হয়ে যাবার নিস্তব্ধতা। এসফাল্ট, জল বা বাতাসের মতো বিমূর্ত ল্যাম্পপোস্টের মতো চিন্তাশীল ও একা। এত বড় হয়ে যাবার পর দুঃখ স্বভাবতই অন্যরূপ নিতে বাধ্য। নিজস্ব নিয়মের মধ্যে আত্মস্থ আমার এই শান্ত বৌদ্ধ মন আমার নিজের কাছে অপরিচিত। এমনও হতে পারে যে আমি মরে গেছি, অন্য কেউ ভাবছে। আত্মহত্যা যদি প্রকৃত অর্থে সহমরণ হতে পারত আমি দ্বিধা করতাম না। এখন আমি আমি না—অন্য কেউ। এ যদি অনেকদিন থাকে তাহলে হয়তো একে

আমি চিনতে শিখব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

"কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, সমর্থক ও তাদের পরিবারবর্গকে হাজারে হাজারে হত্যা করা হচ্ছে। দূরের জেলাগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদের মহড়ার পর সামরিক ইউনিটগুলি হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হত্যা করছে। পারাঙ নামে চওড়া ফলার ছোরাতে সজ্জিত হয়ে উগ্র মুসলিমদের দল রাত্রে কমিউনিস্টদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নির্বিচারে সকলকে খুন করছে এবং মাটি অল্প খুঁড়ে পুতে ফেলছে। পূর্ব জাভার গ্রামাঞ্চলে এই হত্যাভিযান এত নৃশংস হয়ে উঠেছে যে তীক্ষ্ণ বাঁশের ওপরে কমিউনিস্টদের মাথা গেঁথে গ্রামে গ্রামে দেখান হচ্ছে। এত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যে পূর্ব জাভা ও উত্তর সুমাত্রায় মৃতদেহ পচনের দুর্গন্ধ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সব অঞ্চলের খবরে জানা যায় যে ছোট ছোট নদী এবং খাল অসংখ্য মৃতদেহতে আটকে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় জলপথে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"[১]

কালোচোখ কুকুরদের দেখলেই আমার তোমাকে মনে পড়ে। ট্রেনের শব্দে তোমাকে মনে পড়ে···যেমন এখন। নিগ্রোদের গান শুনলে তোমাকে মনে পড়ে। সবসময় সবকিছু শুধু তোমায় নিয়ে আসে আর অন্ধকারে যখন কোনো কিছু দেখা যায় না তখন তোমার শরীরের নিজস্ব আলোয় আমি নিচু হয়ে তোমায় ছুঁয়েছিলাম এক পেলব ও অসহিষ্ণু অন্ধকারে আমি তোমাকে আড়াল করতে পারি কিন্তু এখনো আমি খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারিনি যদিও আমি অত্যন্ত অস্বাভাবিক তুমি আমার চোখের ওপর চুমু খেয়েছিলে আর তোমার ঠোঁটের মধ্যে আমি দেখতাম।

গ্রেপ্তারের সন্ধ্যায় হাজার বা পাঁচশো ওয়াটের চড়া শাদা গোল আলোর সামনে তাকিয়ে থাকলে পেছনে পেছনে কে আছে তাকে দেখা যায় না। সে প্রশ্ন করে। এবং উত্তরে আমি কিছুতেই বলিনি। চার ঘণ্টা পর আলো নিভিয়ে দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়। খাওয়া শেষ করার পর বিছানা। এবং প্রথম ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে তুলে আবার গোল শাদা আলোর সামনে। আলোটা বারবার অন্ধকার হয়ে যায় কিন্তু গরমটা থাকে। মাথার মধ্যে ঘিলু পুড়ছে বলে মনে হয়। আবার চার ঘণ্টা ধরে ইন্টেরোগেশন চলে কিন্তু যে প্রশ্ন করে তাকে দেখা যায় না। পিস্তল রাখার হোলস্টারের চামড়ার গন্ধ আর অন্ধকার থেকে প্রশ্নের সঙ্গে দুর্গন্ধ মুখের নিশ্বাস আর থুথু ছিটকে আসে।

তুমি আমাকে চুমু খেতে শিখিয়েছ আর ঠোঁটের ওপর চুমু খেতে খেতে আমি যখন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন আমি তোমার মুখের সুন্দর গন্ধটা পাই আর আমাদের চোখের পাতাগুলো ছুঁয়ে যায় কিন্তু এরকম করে বেশিক্ষণ থাকা যায় না বলে আমি উঠে খাটের ধারে বসে টেবিলের ওপর হাতড়ে সিগারেট খুঁজি আর দেশলাইটা জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক আলো হয় বলে হাত দিয়ে শিখাটা আড়াল করি কিন্তু আমি জানি যে, দপ করে জ্বলে ওঠা লালচে আগুনে তুমি আমার মুখ ও এলোমেলো চুল দেখতে পেয়েছ আমি কাঠিটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি আর সিগারেটটা জ্বলে উঠতে সেই আলোয় তোমাকে দেখা যায় তুমি তাকিয়ে আছ আমার একটা হাত নিয়ে তোমার বুকের ওপর রেখে নিজের হাত দিয়ে ঢেকে রাখো আর বলো, আমার

---

১ Time Magazine, 15th Dec. 1965

আঙুলগুলো অসম্ভব সুন্দর।

নখের মধ্যে ছুঁচ ঢুকিয়ে দেবার প্রথম যন্ত্রণাটায় মনে হয় হাতের মধ্যে শিরাগুলো ছিঁড়ে কাঁধের দিকে গুটিয়ে আসছে। ছুঁচটা যে ঢোকায় সে চেয়ারে ঝুঁকে পড়ে মুখ দিয়ে কুৎসিত শব্দ করে। পাখা ঘুরছে। হাতটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। ছুঁচটা নখের নিচ দিয়ে শেষ অবধি পৌঁছে যায়। তখন আঙুলের মধ্যে ছুঁচটাকে ঘিরে রক্ত ভয়ে চিৎকার করে। হাড়ের গায় লেগে ছুঁচটা একটু ঢুকতে চেষ্টা করে, তারপর থেমে যায়। তখন নিজের হাতের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে এমন সব শিরা ফুলে উঠেছে যাদের আমি কখনো দেখিনি।

তোমার মতো আমি কাউকে কখনো দেখিনি। কেউ আমাকে এত নিঃশর্তভাবে ভালোবাসতে পারবে না কারো ভালোবাসা এত সমগ্র ও প্রশ্নাতীত নয় কোনো চোখের মধ্যে এত সম্মতি নেই এত সমর্থন কোনো রক্তের সহজাত নয়।

নাৎসিরা বারো লক্ষ ইহুদি শিশু হত্যা করে। নিউরেমবুর্গের প্রথম বিচারটিতে জানা যায় যে মানসিক রোগগ্রস্ত এবং অসুস্থ শিশুদের কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল।

আমি তোমাকে ভালোবাসি দেখ এখন অন্ধকার মাঠ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি রাত্রির ট্রেনে দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম দূরে দূরে গাছের তলায় শুকনো পাতা জড়ো করে কারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে অন্ধকারে তোমার নিশ্বাস নেবার শব্দ যেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ তাই তোমাকে না জাগিয়ে উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতেই তুমি ঘুম জড়ানো গলায় আমাকে বলো রাত্রির শেষ চুমুর কথা আর তোমার স্বাদ নেবার জন্য আমি।

মেশিনগানের মুখে, না খেতে দিয়ে বা জানালা দিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে হাসপাতালের অসুস্থ শিশুদের খুন করা হয়েছে। সাইলেশিয়ার লুবিনিয়েক হাসপাতালে আট মাস থেকে দশ বছরের ২৩৫ জন শিশুর শরীরে লুমিনাল ও ভেরোনাল (·১ থেকে ·৬ গ্রাম) প্রয়োগ করা হয় এবং ২২১ জন শিশু প্রাণ হারায়। এবং এপলফিং হায়ারের ডঃ ফ্যানম্যুলের স্বহস্তে শিশুদের খুন করত এবং অন্য কোনো পদ্ধতি খরচসাধ্য বলে খাবার দেওয়া বন্ধ করে হত্যা করা চালু করে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করছি।

জার্মান সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৪ এবং ৪৫-এর মাঝামাঝি ৪৭ দিনে আউশভিৎজ-অসউইচেম মৃত্যু ক্যাম্প থেকে ৯৯৯২২ জোড়া শিশুদের জামা ও জাঙ্গিয়া জার্মানিতে পাঠানো হয়েছিল।

আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই অন্ধকার নিভিয়ে দাও আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই অন্ধকার নিভিয়ে দাও এবার

··· আমার ঘর সার্চ করবার সময় এই ডায়রি পাওয়া যায়···

৫-৩-৭৩ (মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত)

[আগের অংশের পর থেকে]

এতটুকু রাগ হচ্ছে না, নিজেকে বিস্তৃত আর সমান্তরাল মনে হচ্ছে। সম্ভবত এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় সত্তাই আমাকে বিকৃত কোনো আচরণ করতে দেবে না। যেহেতু এর মননক্ষমতা অনেক বেশি তাই এর সহনশীলতাও অনেক বেশি। সম্ভাব্য কয়েকদিনে আমি যদি এরকম স্মিত ও স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারি তাহলে হয়তো জানব যে আমার

সম্ভাবনার মধ্যে আমি এসে পড়েছি—একেই হয়তো এত অস্থিরতার মধ্যে আমি খুঁজেছিলাম। সমস্ত অভিমান থেকে একা হতে না পারলে নিজেকে চেনা যায় না।

এরপর কিন্তু একটা শব্দ, একটা সময় বা একটা বৃষ্টির ফোঁটায় কিছু একটা হয়ে যেতে পারে। মাত্র একটু অসুখে মৃত্যু। কিন্তু আজ আমি অনেক তারা দেখেছি। আমি মাটির ওপর শুয়েছিলাম। আমার চুল শিশিরে ভিজে উঠেছিল। আমার চলবার শব্দ হয়নি। আমার কথারা কাচে পরিণত হয়েছে। আমার নির্জনতা নিঃশ্বাসে।

এরপর যেখানে যেতে বলবে আমি যাব। দূরে, কাছে, উধাও এপসিলন-এরিডানি, রহস্যজনক পরমাণুর ভরকেন্দ্র বা মেসন-চিহ্নিত পথে। কখনো আমি সম্বিত হারাব না। সমস্ত অভিমান থেকে বিরত হতে না পারলে নিজেকে প্রস্তুত করা যায় না। প্রাচীন লিপির মতো সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ এখনো যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

(সমাপ্ত)

রাজভবন
কলিকাতা
জানুয়ারি ১১, ১৯৭৩

১৯৭৩ সনের ১৪ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারি অবধি দেশের বাকি অংশের সঙ্গে পশুকল্যাণ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে অল লাভারস অফ এ্যানিম্যালস সোসাইটিকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। পশুদের প্রতি নির্দয়তা নিবারণ এবং পশুকল্যাণ উন্নয়নের উদ্দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পশুকল্যাণ সপ্তাহকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করাই অভিপ্রেত।

সকলেই ভালোভাবে জানেন যে আমরা বিবিধভাবে জন্তু জানোয়ারদের দ্বারা উপকৃত হই। তারা আমাদের নিকট প্রতিবেশী, আমাদের সুবিশাল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অপরিহার্য সংযোজক। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাপি, এবং আমাদের ধর্মীয় এবং অনুশীলনগত ধ্যানধারণার বিপক্ষে, আমরা তাদের বিষয়ে উদাসীন,—এমনকী সময় সময় তাদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়েও পড়েছি।

আমি আশা করি পশুকল্যাণ সপ্তাহ উদযাপন মূক বাকশক্তিহীন প্রতিবেশী উপকার সাধকদের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সমাজ বিবেককে উদ্বুদ্ধ করবে এবং যে অবহেলা এবং নিষ্ঠুরতার ভুক্তভোগী তাদের প্রায়ই হতে হয় তা থেকে তাদের রক্ষা করতে সাহায্য করবে।[২]

স্বাঃ এ এল ডায়াস,
রাজ্যপাল

কলকাতায় ফিরে আসা এই আমার শেষ। এরপর আমি অন্য কোনো গ্রহেও চলে যেতে পারি। আপাতত আমি বুধগ্রহ থেকে আসছি। সবুজ আলোর ধাক্কায় ধাক্কায় আমার ট্রেন অন্ধকারকে গলিয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তরল অন্ধকার গলে গলে পড়ছে অক্সি-এসিটিলিন উত্তাপে। আমার জিভ শুকনো এবং রক্ত অত্যন্ত সজাগ। ফিরে আসার এই দীর্ঘ পথ আমি কখনো জেগে নেই, কখনো ঘুমোতে পারছি না। কলকাতায় আমি কিভাবে পৌঁছাব সে কথা আমি এখনো বলিনি! প্রত্যেকবারই এই ফিরে আসাটা একরকম। দুটো মুখোমুখি যুদ্ধরত জিরাফের মতো হাওড়া ব্রিজের ওপরে কলকাতাকে কর্ডন করে আছে কলকাতার আকাশ। তার মধ্যে সূর্যের ম্যানহোল। ৫′৫″ বামন আমি চশমায় কয়লার গুঁড়ো এবং চুলের ওপর ধোঁয়ার তোয়ালে জড়িয়ে কলকাতায় ফিরে

২ অল লাভারস অব অ্যানিমালস সোসাইটিকে রাজ্যপাল ডায়াসের বাণী—১৯৭৩

আসছি। এবং এটাই আমার শেষবার ফিরে আসা। কলকাতার সারা গায়ে রাস্তাগুলো ব্যান্ডেজ এবং স্টিকিং প্লাস্টারের মতো লাগানো। কলকাতায় রাস্তা সারা রাত গাড়ি চাপা পড়ে এবং কুকুর ও মানুষ। কলকাতায় পুলিশভ্যান সার্চলাইটের আলোয় ব্যাঙের মতো উলটানো জিভ বার করে মানুষ ধরে। কলকাতায় মাতালের বমি খাবার পর বুড়ো কুকুরদের নেশা হয় এবং আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদবার সময় তারা তিনটে চাঁদ দেখতে পায়। এবং সশস্ত্র তৎপরতায় তছনছ করে দিতে যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয় সেইজন্যে পাতাল রেল তৈরি করা হচ্ছে। বুধগ্রহের কৃষকদের মতো লুম্পেনরা সেখানে অন্ধকার খোঁদলের মধ্যে থাকবে। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ছুরি চালাচালি হলে ওপরে শব্দ আসবে না। পাতালের দিকে আরো খুঁড়তে থাকলে আমার পৃথিবীর কেন্দ্রের হাজার হাজার ফারেনহাইট গলিত লাভা ও ম্যাগমার মধ্যে ডুব দিতে পারব। কলকাতা বহুদিন আগে মারা গেছে কিন্তু প্রিয় মৃতদেহ আর রেখে দেওয়া যায় না—এবার চুল্লির মুখ খোলা হোক। ধ্বংসের ইতিহাসে হার্কিউলিয়াম বা পম্পেই যে শেষ কথা নয় কলকাতা তা প্রমাণ করে দেবে। কলকাতার ভাগ্য খুব খারাপ। কারণ আমি আত্মহত্যার চেষ্টার পর কিছুদিন স্বাস্থ্যাবাসে কাটিয়ে আবার ফিরে আসছি। সব জেনেও আমি ফিরে আসছি। পালটা সন্ত্রাসে আমার ভয় নেই। কলকাতার মুখ থেকে মনুমেন্টের থার্মোমিটার তুলে নিয়ে আমি দেখে নেব কত জ্বর। তার ডিলিরিয়ামের ভাষা একমাত্র আমিই বুঝতে পারি।

এবং আমি ব্যারিকেড হয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকব।

বুধগ্রহে আমার স্থাবর অস্থাবর যা থাকল তার দায়িত্ব আমি তোমায় দিয়ে এসেছি। একপা-ওলা ক্রাচসহ সেই ছেলেটিকে আমার ভালোবাসা জানিও। আমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করলে ওর একটা পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের মধ্যে তাকালে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। কালো চোখ কুকুর, সদাতৎপর মাকড়সা, নিগ্রো গানের রেকর্ড, স্বচ্ছ অন্ধমাছ, কুয়াশার ফুল, ফাঁকা মদের বোতল, জল, ইতস্তত ছড়ানো সিগারেট, অর্ধভুক্ত রাত্রির খাবার, কাগজ, পেট্রল, জড়তা আক্রান্ত প্রেমিক, উল্কি আঁকা প্রেমিকা এবং হাস্যকর পুলিশদের আমার প্রতিবিপ্লবী অভিনন্দন জানিও। সবুজবিপ্লবের সাফল্যের পর গমগাছ ও কীটনাশক বাষ্পের ত্রাসে যে কৃষকরা শূয়োরের খোঁয়াড়ে গিয়ে লুকিয়েছে তাদের কথা সবসময় মনে রাখবে। এই বিপ্লবকে একমাত্র কুলাকরাই ভয় করে না।

কলকাতা আসবার আগেই আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন গুম গুম করে। এবং উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হয়ে আমি দরজায় গিয়ে রড ধরে ঝুলে পড়ে দেখতে চেষ্ট করি কলকাতা কতদূর। দেখতে দেখতে কপালে হাওয়া লেগে লেগে একসময় ঘুম পাবে। ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটে। পোস্টে লেগে মাথাটা উড়ে যাবার পরেও কবন্ধটা কিছুক্ষণ রড ধরে ঝোলে। কলারের ওপর একটুখানি গলা আর চামড়া দিয়ে জোড়া চুল আটকে থাকা এক চাপড়া খুলির নিচে একটা কান। দরজায় ঘিলু ছিটকে লেগেছে। জামাটা বাতাসে ফুলে উড়বে। শুধু মাথাটা নেই। মাথাটা কুড়িয়ে নেবার জন্যে হাতটা আলগা করে আমি নেমে যাব। মাথাটা কুড়িয়ে পাওয়া অবধি পুরো ট্রেনটা চলে যেতে পারে না। আমি অন্তত গার্ডের কামরায় লাফ দিয়ে উঠতে পারব। এবং এরপর প্রতিশ্রুতিমতো হাতে মাথা নিয়ে অনেক মানুষের সঙ্গে আমি যখন গেটের টিকিট জমা দেওয়ার কোটপরা লোকটার কাছে গিয়ে পৌঁছব তখন সে কি আমাকে ঢুকতে দেবে না?

১৯৭৩

মার্ডারারের ভাই

রাস্তা? মার্ডারারের ভাই, ভাইরে···ট্রিপ যে ফুরিয়ে এল। রাতে রাস্তা বলে কিছু নেই। শহরের মুখে বাঁধা কাপড়গুলোকে যদি রাস্তা বলা যায়। স্ট্যাব করার পর ছুরির হাতলের মতো ল্যাম্পপোস্ট বেরিয়ে রয়েছে। শালা রাতকে হোটেল বানিয়ে দিচ্ছে মার্কারি। এই এত আলো। আবার অন্ধকার। খুন আর গুমখুনের শহর। এত খুন কে করায় গুরু? ভাবতে গেলেই শালা ঘাবড়ে যাব। জোর বৃষ্টি হল তো ম্যানহোলের মধ্যে ঘোলা রক্ত, আওয়াজ, আলো সব পাক মেরে পাতালে নেমে যায়। আর অল্প বৃষ্টি হলে এই রাস্তাই চকচক করে বন্দুকের নলের মতো। শীতে যারা মরে তাদের মড়া চিরতে অসুবিধে হয়। কামড়ে থাকে। পাতাল রেলের বুলেটের ফুটো। তার ওপর দিয়ে ভাঙা কলার বোনের মতো নড়বড়ে তক্তা না লোহার পাতই হবে। বাইক ওপরে চড়তে ফাঁপা আওয়াজ হয়। লাস্টে আবার ভিড়িয়ে দিও না ভাই। লোকে মারলে লোক মরে আর যাদের ভগবান মারে তারা মরে জলে ডুবে, বাজ খেয়ে এ্যাকসিডেন্টে। হাই ভোল্টেজ তামার তার কাটতে গিয়ে মরেছে চাঁদ। পেট উলটে মুখ নীচে করে ঝুলছে আর তার লালায় অল্প-অল্প কারেন্ট। শহরের ওপর পড়ছে আর ঝিমঝিম করছে মাথা···

"এই যে, পেট্রল পাম্পের পরের মোড়টাতে···"

ও গিয়ার নিউট্রাল করে ব্রেক চাপে। মোটরবাইকটা ঘষটে থামে, আমিও ডান পা ঘুরিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়াই। হাত চালিয়ে হাওয়ায় ঘেটে যাওয়া চুলগুলো ঠিক করি। খুব বেশিক্ষণ না চড়লেও সময়টা সিনেমার চেয়ে লম্বা বলে মনে হয়। দুটো পায়েরই থাইয়ের নীচে ঝিঁঝি ধরেছে। পা ঠুকি রাস্তায়। খ্যাঁচামারা আমাকে একটা সিগারেট দেয়। নিজেও ধরায়। লাইটারের আলো ওর চোয়াড়ে মুখটা আলো করে। চোখ বুজে টানে। বাড়ির ঝক্কিতে নেশা করা ছেড়ে দিয়েছে। সিনেমাও আজকাল দেখতে পারে না। আমরা কেউ খাইনি কিন্তু ধুনকিতে রয়েছি।

"চলি তাহলে—আবার দেখা হবে। অনেকদিন পরে দেখা হল।"

"হ্যাঁ, এরকম হঠাৎ হয়ে যাবে। নাইট শোতে হয়তো।"

"আর যা ঝামেলায় ফেঁসেছি। সিনেমায় তো যাওয়াই হয় না। চলি—"

"আচ্ছা।"

শেষটা এইরকম। এর আগে যখন ওর ভাইয়ের হয়ে সারা সিনেমাটা কাঁড়িকাড়ি গুল মারছিল তখন এরকম লাগেনি। পরে বাইক চড়ে ফিরে আসায় সময়েও না। কিন্তু আর শালাকে বরদাস্ত করা যাচ্ছে না। মোটরবাইকটা ধাক্কা দিয়ে এগোয়। ও পেছন ফিরে তাকায় না কিন্তু একবার ডান হাতটা তোলে। এটা আমার জন্যে। কয়লার দোকানের গলি দিয়ে রাতের ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারে একটা ট্যাক্সি আচমকা বেরিয়ে আসে বলে মোটরবাইকটা ব্রেক মারে আর পেছনে লাল আলোর সঙ্গে হলদে ব্রেক লাইটটা জ্বলে। হলদে আলোটা নিভে যায়। শুধু লাল আলো জ্বলছে। এইবার শালা এরোপ্লেনের মতো উড়িয়ে চলছে। চালাচ্ছে মার্ডারারের ভাই।

আমি গেছি মেয়েছেলে আর ফাইট্ দেখতে। আগে বাইরে ফটো দেখলাম। ব্রেসিয়ার পরা সোনালি চুল মেয়ের হাতে বন্দুক আর সমুদ্রের ধারে বালিতে একটা ছেলে মরে পড়ে আছে। দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। মনে হল বাজে হবে না। ও শালাও দেখি নাইট শোতে এসেছে। আরেকটা ছবিতে সেই ছেলেটা আর মেয়েটা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে কিস খাচ্ছে। ছবির নামটা ঠিক ইংরেজি কথা নয়—হবে কোনো জায়গার নামটাম। আগে ফটো দেখে নিলে এমনিতে অসুবিধে হয় না। এক একবার অবশ্য খুব ডাউন করে দেয়, সে ছবিতে শুধু কথা। বাতেলা শেষ হলে যদি একটু কেস থাকে তাতে পয়সা ওঠে না। নিউ এম্পায়ারে ফাঁকা ছিল। পঁচাত্তরের টিকিট কাটছি হঠাৎ ওর সঙ্গে কাউন্টারে দেখা। মুখ চেনা ছিল। ওর ভাই লালচাঁদ মিলনকে মার্ডার করার জন্যে জেল খাটছে। দুজনের চেহারায় খুব মিল। তবে ভাই একটু লম্বা লালচাঁদের চেয়ে। চোয়াড়ে বেশি। ময়লা হলদেটে শাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা। ও আমাকে দেখে হাসল। আমিও হাসলাম। দু-টাকার নোট দিয়েছিল বলে ওর ভাঙতি পেতে টাইম লাগল। তারপর আমরা একসঙ্গে যখন ওপরে উঠছিলাম তখন সিঁড়ি ভাঙতে ওর ঝুঁকে পড়াটা দেখে আমার মনে হল ওর মতোই একটা লোক হলের বাইরে মোটরবাইক থামাচ্ছিল।

"মোটরবাইকে এসেছ···তোমাকেই যেন দেখলাম।"

"হ্যাঁ। দুবছর হল কিনেছি। জাওয়া।"

হলের ভেতরে ঢুকে একেবারে ওপরের দিক দুটো সিটে আমরা আরাম করে বসলাম। তখন কাটিংফাটিং চলছে। আমার কাছে দুটো সিগারেট ছিল। ওকে একটা দিলাম। ওর লাইটার জ্বালল। নিউ এম্পায়ারে দশ আনার টিকিটের দাম বাড়লেও সিগারেট খাওয়া যায়। আর নীচের রোতে বসলে তার নীচের ব্যালকনিতে কিছু জড়াজড়ি দেখলে আওয়াজ দেওয়া যায়, কাগজ পাকিয়ে ছোঁড়া যায়। আমাদের বয়স এখন ওসবের পক্ষে অনেক ভারী হয়ে গেছে। ওর ভাই তো মার্ডার করে জেল খাটছে। আমি চাকরি করি। কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরির আফিসে খাতা লিখি—বলের বাক্স, পুতুলের বাক্স, আলতার বাক্স তৈরি হয়। ওর নামটা আমার মাথায় আসে না, কিছুতেই না। একবার মনে হয় ও লালচাঁদের বড়, আবার মনে হয় ছোটই হবে। আরো একটা না দুটো ভাই আছে ওদের। চিনতাম লালুকেই। ওর সঙ্গে মুখচেনা। নিউজরিল। কি সব কারখানার ফিতে কাটা হল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা পনেরো ষোলো লোক হবে। আশেপাশে কেউ না থাকলেও গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করি—

"ক-বছর হল লালুর?"

অন্ধকারে সিনেমার আলোয় ওর মুখটা চকচক কর। "লালুর—সাড়ে তিন বছর হল।"

কথাটা বলে ও মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চুপ করে থাকে। আমি দেখলাম ও সিনেমা দেখছে না। এরোপ্লেন থেকে একটা লোক নামল। মালা নিল। তারপরেই খেলার ছবি শুরু হতে দেখলাম আবার ও দেখছে। রোভার্স ফাইনালে। ও সামনের সিটের ওপর পা দুটো চালিয়ে দিল। একেবারে সামনে দুটো ছেলে সিনেমা না দেখে নীচের ব্যালকনিতে কি দেখছে ঝুঁকে পড়ে।

"তুমি তো কাশীদার ফুটবল ক্লাবে ছিলে—"

"হ্যাঁ।"

ওর কথার আইডিয়াটা আমি বুঝতে পারি—লালুও ওখানে খেলত। লালুর কথাটা বেমক্কা মুখ ফসকে বলে ফেলে যে বিরাট ভুল করে ফেলেছি সেটা তখনো আমার মাথায় আসেনি। অবশ্য না বললেও কথাটা ঠিক উঠত। একটু পরে হাফটাইমে ও বাইরে গেল কিন্তু আমি বসেই থাকলাম। ওপরে শস্তার সিট বলে সারায় না। ওপরের দেওয়ালটা কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া। ছাতাপড়া। মাল বোধহয় এই বাজারে ভালো পয়সা করেছে। বাইক কিনেছে। কিন্তু দশ আনায় সিনেমা দেখাটা ছাড়েনি। আবার হয়তো করেওনি। ফুলুকে হয়তো কিছু টাকা পেয়েছিল। সেটা ফুঁকে না দিয়ে মোটর বাইকটা কিনেছে। আসলে দশ আনায় সিনেমা দেখা অনেকটা অভ্যাসের ব্যাপার। আর সব হলে দশ আনা একেবারে সামনে। কেবল নিউ এম্পায়ারে ওপরে। আর সামনে বসে দেখে দেখে এমন চোখ বসে গেছে যে বেশি দামের টিকিটে গেল মনে হয় ছোট দেখছি। একটু পরে ও প্যাকেটের চানাচুর কিনে ফিরে এল। প্যাকেটটা ছিঁড়ে এগিয়ে দিল। দেখলাম ওর হাতের ঘড়িটা পুরোনো—বাবার ফাবার হবে। শার্টটাও নোংরা। বলল ও সার্ভিস করে না। ব্যবসা। স্পেয়ার পার্টস।

"আজকাল তো সিনেমা দেখাই হয় না। পুরো বাড়ির ঝক্কি, ব্যবসা—সব সামলে আর এনার্জি পাই না। বাড়ি ফিরলে মনে হয় নেশা করে চুর হয়ে আছি। আগে কোনো ভালো পিকচার এলে ছাড়তুম না।"

"এখন?"

"মাসে একটা দুটো—তাও হয় না। ইংলিশ ছবি দেখতুম খুব। সব ওয়েস্টার্ন।"

এমনি সেমনি অনেক গল্প হয়। স্লাইড চলে। নিউ এম্পায়ার হলের বাজনাটা বাজে। রেডিওর শুরুর বাজনার মতো এদেরও একটা মিউজিক আছে। আমার ওকে বেশ ভালো লাগে। ওদের পাড়ায় কেউ ওদের সঙ্গে মেশে না। মিলনকে মার্ডার করেছিল ওর ভাই। তারপর থেকে ওরা পাড়ায় একঘরে হয়ে গেছে। সিনেমা শুরু হয়। খুব রঙের খেলা। লাল লাল দাগ পড়ছে গুলির শব্দ হচ্ছে আর নামগুলো পড়ছে। টাইটেল দেখেই বোঝা যায় যে ছবিটা জমবে। আমি ওকে বেশ আস্থার সঙ্গে বলি—"ছবিটা ভালো হবে।" আবার চানাচুরের প্যাকেটটা ও এগিয়ে দেয়। হাসে আর পা দুটো নাড়ায়। ওদের মতো একটা ঘটনা আমাদের পাড়াতেও আছে। চুরি করেছিল বলে বউ আর শাশুড়ী পিটিয়ে পিটিয়ে বাড়ির ঝিকে মেরে ফেলেছিল। তারপর গলায় দড়ির কেস সাজিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কারো কিছু হল না। তখন থেকে ওদের বাড়ির নাম হয়ে গেল খুনিয়ালদের বাড়ি। ওদের বাড়ির ছেলেরা খুব ঘুড়ি ওড়াত। কিন্তু কেউ ওদের সঙ্গে প্যাঁচ

খেলত না। অন্যান্য ছাদ থেকে ছেলেরা চেঁচাত—দুয়োক্কো, খুনিয়ালকো, লড়েনাক্কো। ওরা যখন বেড়ে এগিয়ে আসত তখন সবাই ঘুড়ি সরিয়ে নিত। এদের বাড়িটাও ওরকম হয়ে গেছে। কাছাকাছি পাড়ার ব্যাপার বলে সব খবর আসে। ওর নামটা অবশ্য কখনো ওঠে না।

মেমটাই বোধহয় ডিটেকটিভ। পুরোই বোঝা গেল যে আগে টেবিলের ওপারের চুরুট মুখে টাকমাথা সাহেবের কাছে ও অর্ডার নিচ্ছিল। এয়ারপোর্টে নামতেই একটা নিগ্রো ওর ছবি নিল। তারপর রাস্তার ধার থেকে একটা গাড়ি মেমের গাড়িকে তাড়া করল। খুব জোর রেস। টায়ার ঘসটানো কিঁচকিঁচ শব্দ। মেমকে যারা তাড়া করছিল তাদের গাড়ির সামনে একটা ট্রাক রাস্তা আটকে দাঁড়াল বলে আর ধাওয়া করা গেল না। আমার এরকম সিনেমা দেখতে ভালো লাগে। মেমটা ক্যাঁচা।

"লালু কিন্তু মিলনকে মার্ডার করেনি। ওকে ফাঁসাল এমন যে যারা খুন করল তাদের সঙ্গে লালুরও জেল হয়ে গেল। ব্যাপারটা জানো?"

ব্যাপারটা ভালোভাবেই জানি। বুঝলাম ও গ্যাস দিচ্ছে। ওর মুখে চানাচুর আর জর্দার গন্ধ। বললাম, "সবই নানামুখে শোনা। ওই সময়টা তো আমি কলকাতায় ছিলাম না।" এইবার তুমি নাও। আমি এখন এরকম দিয়ে যাব।

"তুমি তো লালুর সঙ্গে খেলেছ। ও মার্ডার করতে পারে? মার্ডার করল তো জিন আর বিনোদ। আসলে লালুর ওপর মিলনের বাড়ির খুব রাগ ছিল, ওরাই তো টাকা খাইয়ে লালুকে ফাঁসাল? এসব বলেছে?"

"শুনেছিলাম দুনম্বরি টাকার বখরা নিয়ে লালুর সঙ্গে একটা হেয্যাহেয্যি হয়েছিল। তবে জিন বিনোদ কেন—পাড়ার অনেক মালই যে দুনম্বরিতে নাম লিখিয়েছে একথা সকলেই জানে। লালু তো ওখানে যাওয়ার ছেলে নয়।"

"তোমাকে এই বলেচে বুঝি। সত্যি কথা, ফ্যাক্ট কেউ জানেও না, জানলেও বলবে না। উলটোপালটা যে যাকে পারচে পড়াচ্ছে। শুনলে ইউ ওয়ান্ডার ওটা মেয়েছেলের ব্যাপার। সরকার উকিলদের বাড়ির মেয়ে। ওর সঙ্গে তো লালুর লাভ কেস ছিল। পরে মিলন ওই বাড়িতে খুব ন্যাকড়াবাজি করত। জিন আর বিনোদের সঙ্গে ওই মাগী নিয়েই মিলনের আকচা-আকচি হয়। তখন লালু হাত ধুয়ে ফেলেচে। শুনলে অবাক হয়ে যাবে লালুর জন্যে তো মেয়ে দেখছিল বাড়িতে। শালা মারামারি করলে তোমরা মেয়েছেলে নিয়ে, তোমরা মরলে আর মেয়েটার সঙ্গে লালুর একটা কেস ছিল বলে ভাইটাকে ফাঁসালে।"

আমি অবাক হয়ে যাই। মেমসাহেব দরজা বন্ধ করে জামাকাপড় ছাড়ছে।

"এসব কেউ বলেনি। মেয়েফেয়ে ছিল এই শুনলাম।"

"তাহলে বল! ওরা মিলনকে মার্ডার করল। দুনম্বরিও কিছু থেকে থাকবে। ওর বাড়ির লোকগুলোও হারামি। নিজেদের ছেলে ভোগে গেচে তো দাও অন্যের ছেলেকে ফাঁসিয়ে। যা দিনকাল—টাকা দাও, বাড়িতে হাতির বাঁট এনে দুধ দুয়ে দিয়ে যাবে।"

পুরো ফ্যাক্টটা আমি জানি। যা হয়েছিল সব। মার্ডারের পর যখন ছাড়ল তখন মিলনের বডিও আমি দেখেছিলাম। মেমসাহেব এক চৌবাচ্চা ফেনা করে সেখানে শুয়ে পা তুলছে আর সাবানের ফেনা গড়াচ্ছে। আজব কল মাইরি। জল নেই শুধু ফেনা। অনেকটা ঘোড়া জল খাওয়ার লোহার চৌবাচ্চার মতো দেখতে। পুরো কেসটা আমি জানি। মিলনের সঙ্গে ওই মেয়েটার অনেকদিনের ভালোবাসা। সব ঠিক ছিল। লালু শুধু

মার্ডার করেনি, করিয়েছে।—জিন, বিনোদ, ময়না রাজসাক্ষী। —ওরা হচ্ছে বাংলার চাটার মাল—দুচার পয়সা চেয়েচিন্তে একে ঢপ দিয়ে ওকে চমকে চালায়। কে চালায়। কে চালায় না? ওরা কি মার্ডার করত লালু না করালে।

"তুমি তো আমার ভাইয়ের সঙ্গে খেলেছ। বলো, ও মার্ডার করার ছেলে? একটা মানুষের জান নিয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়।"

চুপ করো শালা। মেম এখন জামাকাপড় পরছে। চুল ভিজে। হোটেলের ঘরে হাঁটতে গিয়ে পায়ে কি লাগে। খাটের নীচ থেকে একটা হাত বেরিয়ে। হাতটা ধরে ও টেনে বের করে। নিগ্রোটা ছবি তুলেছিল। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। মরা। মিলনকে ডাক্তারখানা থেকে রাতে আড্ডা মেরে ফেরার সময় ওরা ধরেছিল। শীতের রাত। লালু বোমা চার্জ করেছিল। দুটো। প্রথমটা লাগেনি। পরেরটা পায়ে লেগে ও পড়ে যায়। তখন জিন বা বিনোদ ওকে স্ট্যাব করে। ও ভাবছে দুনিয়ার লোক ঘাস খায়। শালা হাড়গিলের বাচ্চা। ওকে আমি এক্ষুনি বলে দিতে পারি যে মিলন ডাইং স্টেটমেন্টে ওদের সবার নাম বলে গিয়েছিল। হাসপাতালে বেঁচেছিল ঘণ্টাদুয়েক।

"সবটা জেনে ভালো হল। আমি জানতাম গড়বড় কিছু একটা আছেই। মধ্যে থেকে লালুটার লাইফ বরবাদ হয়ে গেল।"

"আর ভাই কি করব। ফাঁসাল। এই ক্যাচালে না জড়ালে আজ লালু দু-হাজার টাকা মাইনে পেত। ওর তো জাহাজ কোম্পানিতে কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল।"

আমিও দিয়ে যাচ্ছি, ও নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মিলনের বডি দেখেছিলাম। সেলাইয়ের পর কেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল। পেটটা যেন নেই। বুকের তলা থেকে হলদে দুটো পা বেরিয়েছে আর আমায় শালা বোঝাচ্ছে ওর ভাই মার্ডার করেনি। মেমসাহেবের পা দুটো সবচেয়ে ভালো। আমার একটু অসুবিধে হয়, আবার ও কথা বলে। মেমসাহেব ছুটছে। হোটেলের বারান্দা দিয়ে। লিফটের থেকে দুটো লোক বেরিয়ে এল।

"সিনেমায় মার্ডার দেখতে বেশ লাগে। আমরা এত খুন খারাবি দেখছি কিন্তু সব বেঁচে আছে।"

মিলনও বেঁচে আছে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বাঁচবে ও ডাক্তারখানা থেকে শীতের ধোঁয়াটে ফাঁকা রাতে বেরিয়ে আসার পর থেকে। ফার্স্টের বোমাটা মিস করবে ওকে। ধোঁয়া। আচমকা পায়ের কাছে বোমা পড়লে লাগুক না লাগুক মানুষ একটু কার্ণিক খেয়ে যায়। কয়েকটা স্পিল্‌নটার বলবেয়ারিং-এর ছোটগুলি বাড়ির দেওয়ালে, জানলায় লাগে। পরের বোমাটায় থোড়ার মাংস উড়ে যাবে হাড় বের করে। তারপর ছুরি খাবে। পাঁজরের নীচে বাঁদিক চেপে ঢুকবে। তারপর একটু নেমে এল হয়ে ডানদিক অব্দি লিভার, নাড়িভুঁড়ি সবকিছু ঘেঁটে-ঘুঁটে দিয়ে ফালা করে চলে যাবে। ধোঁয়ার মধ্যে লালু, জিন আর বিনোদকে মনে হবে নাচছে। দূরে লোক চেঁচাবে।'হইচই। দৌড়বে। তারপর মিলন ডাইং স্টেটমেন্ট দেবে। সব নাম বলবে। এটা যদি সিনেমা হয় তাহলে এটা বারবার দেখা যায়। আমাদেরও বার বার দেখা যায়।

"যে মেয়েমানুষটাকে নিয়ে এত ঝামেলা সে কিন্তু জবর আছে। গত বছর তো বিয়ে হল। বোম্বেতে বর কাজ করে।"

"সবটা লাগিয়ে দিয়ে এখন আর কোনো হ্যাপনাতে নেই। ভালো লাইন বল!"

"আরে ভাই দেখবে। ভগবান ছাড়বে না। ঠিক খবর নেবে।"

পুরো সিনেমাটা এরকম করে যায়। বার বার ও ভাইয়ের কথা বলে। এমন করে বলে

যেন এতদিন কাউকে বলতে পারেনি। আর কোনোদিন ও যেন কাউকে বলতেই পারবে না। সামনে আরো খুন হয়। চাকু চলে। ক্যারাটে। জাপটাজাপটি, চুমোচুমি, নাচ, জলের তলায় কাচের মুখোশপরা ডুবুরি। যখন জলের তলায় মেয়ের মুখ দিয়ে বুড়বুড়ি উঠছে আর ছোট মাছের ঝাঁক ওকে ঠুকরোয় তখন মার্ডারারের ভাইয়ের নোংরা শাদা শার্ট আর চোয়াড়ে মুখের ওপরে নাকের ওপরে কপালে চোখে নীলচে আলো পড়ে। ঘামের গন্ধ। দুবলা হয়ে পড়েছে ভাইয়ের কারণে।

"আগে নেশাভাঙ করতুম। এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। সিনেমাও তো দেখাই হয় না।"

কে জানতে চায় শালা তোমার দুঃখের খবর। আমার আবার ওর জন্যে একটু খারাপ লাগে। একটা ঘটনা মানুষকে কি করে দেয়। তোমার মাথার ঘিলু নড়ে গেছে। নিজে জানে না।

"বাড়ির সব ঝক্কি এখন ঘাড়ে। তা না হলে কত কি করে ফেলতুম। কেমন একটা ভয় হয়ে গেছে।"

যে ছেলেটাকে চুমু খাচ্ছিল, জড়াচ্ছিল তাকেই শেষে গুলি করল। ছেলেটা অপোজিট পার্টির লোক। আর গুলি করবে নাই-বা কেন? ছেলেটাও তো রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। ওই জায়গাটা তুলেছে দারুণ। ছেলেটার শার্টটার বুক খোলা, নীচে গিঁট বাঁধা। জিনস্ প্যান্ট পরে। গুলিটা খেয়েও ও মেয়েটাকে কাছে পাবার জন্যে নিজের রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে দেয়। ও যখন মরে যাচ্ছে তখন মেমটা ওকে চুমু খেল। লাশটা পড়ে থাকল। ছবি শেষ। এইবার তাহলে ওর সেলাই করা বুকের তলা থেকে দুটো হলদে পা বেরুবে।

আমার আর ফেরার বাস ভাড়া লাগে না। নাইট শো ভাঙলে যেমন দেখা যায় দোকান-পাট সব বন্ধ, রাস্তা অন্ধকার পানের দোকানের সামনে কয়েকটা লোক। তার মধ্যে একজন এই রাত্তিরে লেমনেড খাচ্ছে। ও আমাকে বলে পাড়ার মোড়ে ছেড়ে দেবে। ওকে একটু দাঁড়াতে বলে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে আমি তিনটে ফিলটার সিগারেট কিনে আনি। এ পাড়ায় দু-তিনটে সিগারেট চাইলে দোকানদাররা পাত্তা দেয় না। ও বলে সিগারেট তো ছিল। দুজনে ধরাই। একটা আমার পকেটে থাকে। বাইকটা স্ট্যান্ড থেকে ঠেলতে পেছনের চাকাটা রাস্তায় পড়ে। ও বসে যা কিক্ মারে। স্টার্ট হলে আমি বসি। হাওয়া। আড়াই হর্স-পাওয়ার।

মার্ডারারের ভাই, ভাইরে, ব্রাদার—ছোটাও তো এবার মৌজে দু-চাকা। এ হল সিনেমা। ছেলেটা কিন্তু ভালো। একট ছিটিয়াল আছে। এই ছিটটুকু ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। শালা এখন যদি একটু মাল খাওয়া যেত তাহলে পুরো তর হয়ে যেত। পেটে মাল, গলায় রুমাল, ধরা পড়েছি, সঙ্গে বামাল। বামাল মানে চেম্বার। এখন একটা চেম্বার পেলে শালা ছররা ভরে ডাইনে বাঁয়ে বেলুন ফাটাতুম। এক নম্বর ফাটত এই ভাইটির মাথা। পাগল শালা। চালাও গুরু। দাঁড়াও—আঙটাটা ধরি। বউকে যখন চড়াবে তখন তোমার কোমর জড়াবে। এখন তোমার বাপ চড়ছে।

মোটরবাইকটা স্পিড নিয়ে কেতনে রাস্তায় ওঠে। রাতের ঠাণ্ডায় কেমন কেমন বশ হয়ে যায় তিনজন। আমি, মার্ডারারের ভাই আর মোটরবাইক। বুঝতে পারি আমার চুলগুলো মাথার একদিকে চলে গেছে। জেব্রা ক্রসিং দূর থেকে আসে। হঠাৎ নীচে হাসি আর খই ছড়িয়ে যায়। জেব্রা ক্রসিং পেছনে চলে যায় দূরে। খুনির ভাইয়ের মোটরবাইকে চড়ে এইভাবে আমি বাড়ি ফিরে।

"একটু বেড়িয়ে গেলে অসুবিধে হবে?"

"না, ময়দানের দিকে চালাও।"

অন্ধকার কয়লা ফুটো করে বাইকটা বেরিয়ে যায়। পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে। কতকগুলো মেয়েছেলে তুলছে। রাস্তার বাঁক—কয়েকটা ক্লাব টেন্টের পাশ দিয়ে ঘুরে চাঁদের জমিতে চলে গেছে—এখানে মোটরবাইকের কোনো ওজন নেই। মেয়েগুলো হাসছে। চালাচ্ছে মার্ডারারের ভাই। মার্ডারার জেল খাটছে। আসলে আমরা ফেকলু। আমাদের পকেটে পয়সা নেই। তাই এই মার্ডার ফার্ডার হয়ে যায়। এই যে উড়ন্ত মোটরবাইক, অন্ধকার ময়দান, আলো, গাড়ির মধ্যে মাতালের চিৎকার, আকাশবাণী ভবন, ভিক্টোরিয়া, রেড রোড—সবকিছুর মধ্যে খুন আছে। আমার এক বন্ধু অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছিল। হাওয়া আমাকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে। মার্ডারারের ভাইয়ের ঠোঁটে সিগারেট। ফুলকি উড়ছে।

আমার সেই বন্ধু রাস্তায় জমা জলের মধ্যে নেমে গিয়ে নাচছিল। তখন একটা কাওয়ালির রেকর্ড বাজছিল মাইকের দোকানে। রেকর্ড শেষ হতেই আবার চালানো হচ্ছিল ওকে নাচাবার জন্যে। সেই সময় বাজ পড়ে ও মারা যায়। রেকর্ডটা বন্ধ করলে ও কিন্তু আগেই উঠে আসত জল থেকে। ওর ঝলসানো মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। লাশটা তুলে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখেছিলাম রাস্তার জলে ওই জায়গাটায় চর্বির মতো কি ভাসছে। আসলে ওই কথাটাই। আমরা যে কোনো সময়ে খুন হয়ে যেতে পারি।

রাস্তাটা উলটো। আমাদের মোটরবাইকটা ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। রাতের শহর। বাইকটা চালাচ্ছে মার্ডারারের ভাই। আমরা একটা ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। চৌরাস্তায় ট্রাফিক সিগনালে সারা রাত লাল আলো জ্বলে আর নেভে। ও বলছে ওর ভাই মার্ডারার না। কিন্তু ও মার্ডারারের ভাই। ওর সঙ্গে সময় কাটছে আমার। আসলে আমরা গরিব। ভুক্কাড়। তবে ও এখন ধুনকিতে রয়েছে বলে তেল পোড়াচ্ছে, একটা চীনে ছেলে আর লুঙ্গি পরা লোক আমাদের থামতে বলছিল। কেন? কোথায় চাঁদ উঠছে এত আলো নিয়ে? এত তারা দিয়ে কি হয়? এই শহরের মানে কি? এত বাতাসের কি দাম যাতে নিশ্বাস আটকে যায়? মার্ডারারের ভাই চালাচ্ছে। ও জানে আমি আসলে কেসটা জানি না। অনেক ধান্দা করেছে ওর ভাইকে সাইজ করার জন্যে। কিন্তু পারেনি। একজনকে পেয়ে ও ভাবছে ওর ছুটি হয়ে গেল। ওর কলজেতে এখন খুব আনন্দ। আমি তো সবকিছু জানি। আমার বলার কোনো দরকার আছে? ওর সঙ্গে হয়তো আর দেখাই হবে না। রাস্তা এদিকে ফুরিয়ে এল। বন্ধ গয়নার দোকান, বাড়ি, মেয়েদের ইস্কুল, দেওয়াল···

···ও পেছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু একবার ডান হাত তোলে। এটা আমার জন্যে। কয়লার দোকানের গলি দিয়ে রাতের ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারে একটা ট্যাক্সি আচমকা লাল আলোর সঙ্গে হলদে ব্রেকলাইটটা জ্বলে। হলদে আলোটা নিভে যায়। শুধু লাল আলো জ্বলছে। এইবার শালা এরোপ্লেনের মতো উড়িয়ে চলেছে। চালাচ্ছে মার্ডারারের ভাই।

দূরে চলে যায় মোটরবাইক। বাতাসে জামাটা ফুলে ওকে দূর থেকে বিরাট বেঢপ দেখায় আর অন্ধকারে মাথাটা আলাদা করে দেখাই যায় না। মনে হয় একটা লোক, মুণ্ডু নেই, মোটরবাইক চালিয়ে যাচ্ছে। পকেট থেকে চিরুনিটা বের করে আমি চুল আঁচড়াই। আমার মুণ্ডুর ঠোঁটে ওর দেওয়া সিগারেট জ্বলছে। সিনেমাটা ভালো করে দেখতে দিল

না। আর ওকে দেখাই যায় না। দূরে শব্দটা রাত বলে শোনা যায়। ছোট হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। মুণ্ডু নেই। মোটরবাইক চালাচ্ছে মার্ডারারের ভাই।

আমি ফিরি। মোটরবাইক চড়িয়ে এমন অভ্যেস করে দিয়েছে যে হাঁটতে কষ্ট হয়। শালা হারামির বাচ্চা।

১৯৭৯

বুড়া কাহারের পুঁজিপাটা

অল্পবয়সী ইস্কুল মাস্টার কমরেড, জিপের শব্দের জন্য চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে—"কি কাহার বললেন?"

অনিলবাবুর ঝিমুনি আসছিল—"অ্যাঁ···কিছু বলছো ভাই?"

"কি কাহার বললেন?"—"বুড়া, বুড়া কাহার···" আবার ঝিমোতে থাকেন অনিলবাবু।

ইলেকশন ক্যাম্পেনের সময় অনেক সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনিলবাবু হরিণবাড়ির সাউথ ওয়েস্টে গোবধের দিকে যেতে পারেননি। ওরা গিয়েছিল ঠিকই। ট্রাকের উপরে কয়েকটা নতুন সাইকেল, কাপড়-চোপড়, ফ্লাড রিলিফের চেপে দেওয়া সায়েবদের বুকের দুধ আর তাড়া তাড়া পোস্টার নিয়ে। অথচ ওরা হেরে গেল। রাস্তাটা আরো ভালো করার জন্যে চাপ দিতে হবে এবার এবং সে লাইনে পার্লামেন্টের চেয়ে অ্যাসেমব্লির ক্যান্ডিডেটেই বেশি দরকার। এইসব ভাবতে গিয়ে ইস্কুল মাস্টার দেখল তার জিভ কেমন শুকনো শুকনো চটা-ওঠা বলে মনে হচ্ছে। কাল রিসেপশন ছিল সদর রবীন্দ্র মঞ্চে। আজ গোবধ। ওবেলাই বোধহয় রকেট সার্ভিসে কলকাতা রওনা হবেন অনিলবাবু—সেখান থেকে কথাবার্তা বলে নিয়ে দিল্লি। চাকায় হাওয়া নেই বলে পাম্প করছে? ভাড়া করা জিপ। লজ্‌ঝড়ে। সদরের এক কালোয়ারের সাইড বিজনেস। অবিশ্যি পেট্রল খরচই নিচ্ছে বলা চলে···এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে হরিণবাড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা পার্টির বশিষ্টচরণ দাসের চেয়ে ষাট হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন···অনিলবাবু, হ্যাঁ, তেভাগা আন্দোলনের সেই লিজেন্ড অনিলবাবুরও এটা জীবনে প্রায় রাজনৈতিক পুনর্জন্ম। জিপের মাথায় শিকে পরানো লাল ফ্ল্যাগটা উড়ছে। নামটা বড় ভালো লেগেছে ইস্কুল মাস্টার কমরেডের, বুড়া কাহার। অনিলবাবুর সেই ফর্টি সিক্সের কৃষক কমরেড। জোর করে না দাঁড় করালে, বিশেষত কলকাতা থেকে জেলা লেভেলে চাপ না এলে এরকম যে হত না সেটা বুড়া কাহার বাদে আর সকলেই জানে। তার কাছেই এখন অনিলবাবু যাচ্ছেন। একপাল গরু দু-ভাগ হয়ে দৌড়োদৌড়ি করে

রাস্তার দুপাশে নামে। একটা বাছুর কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে থতমত খায়। জিপটা আস্তে হয়।

খালি গায়ে বাংলার কৃষক। ট্রাকে চাপা পড়া সাপ রাস্তায় শুকিয়ে চেপ্টে থাকে তাকে আবার চাপা দিয়ে জিপ বেরিয়ে যায়। এই বেল্টগুলো বরাবরই খুব ভায়োলেন্ট ছিল। জিপটা একটা ব্যাদড়া ঝাঁকুনি মারতে ইস্কুল মাস্টারের মাথা উপরের ক্যাম্বিসেও গুঁতো খায়। সভয়ে সে তাকিয়ে দেখে অনিলবাবু নির্বিকার। বুড়া কাহারকে ওঁর দরকার। গোবধের বুড়া কাহার। গোবধ-মহিষবধ বেল্ট তেভাগাতে একটা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। পুলিশ ঢুকেছিল যত বেরিয়েছিল তার চেয়ে কম। অবশ্য এসবই অল্পবিস্তর রূপকথা। আর বয়স্করা সবকিছুই একটু বাড়িয়ে বলে ও লেখে। উলটোদিক থেকে একটা বাস এল বলে জিপটা পাশে সরল। ওই জায়গায় ধুলোর একটা ঘূর্ণি হল। অনিলবাবু হাত তুললে দশ হাজার লাঠি উঠত···গ্রামের মেয়েরা অবধি বেরিয়ে আসত বঁটি-কুড়ুল নিয়ে···তেভাগা চাই··· অনিলবাবু তখন অনায়াসে বিশ মাইল হেঁটে চলে যেতেন··· এবং ওঁর ছিল সেই সিক্সথ সেন্স যেটা না থাকলে হয় না··· সব গোয়েন্দা রিপোর্ট ওলটপালট হয়ে যেত, তেভাগা চাই···এক ঝাঁক তীর এসে পড়তেই পুলিশ পিছু হটেছিল গোবধের মাঠে···তখন রাত বলে প্রথম কয়েকটা তীরের ফলায় কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বালানো···আটখানা লাশ লাল-ঝাণ্ডা হাতে করে পড়েছিল···পুলিশ লাশ কাড়তে পারেনি···ধামসা বাজতে থাকে মশালের আলোয় আর লাশগুলো গ্রামের মাঝখানে শোয়ানো ছিল···চাপা কান্না···এই মাত্র খবর পাওয়া গেল হরিণবাড়ি লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনতা পার্টির বশিষ্ঠচরণ দাসকে একলক্ষ বাইশ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছেন···ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস ও অন্যান্য তিনজন নির্দল প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে···ঘোলা নদীর পাড়ে আটটা চিতা জ্বলে···আর বুড়া কাহারের চোখ তার ভাই আর দুই ছেলে ও পাঁচ জনের চিতার কাঠপোড়া ধোঁয়ায় জ্বালা করে···তেভাগা চাই···

ড্রাইভারের পাশের সিটে মালাগুলো রাখা ছিল গতরাত থেকে। সদর যাওয়ার হাইওয়ে ছেড়ে জিপ কেতরে মেঠো রাস্তায় উঠে কিছুটা যাওয়ার পর আবার বাঁধানো রাস্তা আর পাশে ঘোলানদী পেল। এইরকম হচ্ছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রায়োরিটি পাওয়ার ফলে এলাকাগুলোর মুখ পালটে গেছে। রোগা গোরু আর মানুষের সামনে দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ছুটছে, আকাশে উঠছে বিদ্যুৎ সরবরাহের টাওয়ার···ঘোলানদী এখন যেমন দেখতে তেমন সারা বছর থাকলে রিলিফ শব্দটা বাতিল হয়ে যেত···তখন ঘোলানদী ঘোলাজলের পাকে মানুষ, বাড়ি, গাছ সবকিছু আত্মসাৎ করে চারদিকে থইথই করে। আপনারা জানেন লাগাতার গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ঘাঁটিগুলো এই নিরন্ন অসহায় কৃষকদের মধ্যে দানা বেঁধেছে তা অটুট এবং অত্যন্তভাবেই বলশালী। হাজার হাজার মানুষ আমাদের সভায় এসেছেন, আমাদের ভোট দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের দেখার জন্য, আমাদের কথা শোনার জন্য ভিড় করেছেন। আমরা জোর গলায় বলতে পারি আমরা বন্দুকের ভয়, গুণ্ডামির ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি করে বা ধোঁকা দিয়ে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে লোক আনিনি। তাঁরা এসেছেন স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। আমরা লরি পাঠাইনি। আমরা বাস পাঠাইনি। আমাদের রাজনীতি আর তাঁদের জীবননীতির মধ্যে কোনো ফারাক নেই বলেই তাঁরা এসেছেন। কমরেড, আমি বিশ্বাস করি এটা এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটা দিন আমরা এগোচ্ছি। সামনের দিকে। তাই আমার এই জয় কোনো

বিশেষ একটা ঘটনা নয়···ভোরের দিকে আকাশে হঠাৎ পাহাড় দেখা যায়। অনিলবাবু একটা দৃশ্য খুব মনে পড়ে। পরীক্ষা দিয়ে দেশে ফিরে সাইকেল নিয়ে বেরোতেন। পাগলতাড়া অবধি গিয়ে আবার উলটো প্যাডেল। তখন একবার খুব ভোরে আকাশে রোদ্দুর ঝলমল পাহাড় দেখেছিলেন। তারপরেও অনেকবার দেখেছেন। কিন্তু ওই দেখাটাই মনে পড়ে। সে বছরেই ময়নাগুড়িতে চারু মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হয়। জিপটা ঘ্যাঁচ করে থামে···পিচ রাস্তা নেমে দুটো রাস্তায় ভাগ হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার একটা বাচ্চা কোলে মেয়েকে গোবধের রাস্তাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল। অনিলবাবু নিজেই একবার ঘোলানদীর দিকে তাকিয়ে বলে দেন বাঁদিকের রাস্তাটা ধরতে। বাঁদিকে··· বাঁদিকে··· জিপ এবার প্রচণ্ড এবড়োখেবড়ো দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে। গাড্ডা, খোঁদল আর মাটি শক্ত বলে পাথরের মতো। প্রথম গাড়িই এসেছিল বোধহয় পুলিশের। তারপর পরিখা কাটার পর আর আসেনি। চোরাবাটগুলো কয়েকটা স্পাই চিনলেও তারা ওই রাস্তায় পুলিশকে যেতে বারণ করত। ১৯৪৬···বর্গাদারকে একের-তিন অংশ ভাগ দিতে হবে··· বুড়া কাহার··· পাঁজিয়া, নালতাবাড়ি, মৌভোগ··· ১২১ রাউন্ড গুলি চলেছিল খাঁপুরে··· মরেছিল ২২ জন··· আর গোবধের মাঠে আটটা লাশকে ঘিরে মশাল জ্বলেছিল—সারারাত—বুড়া কাহারের দুই ছেলে আর ভাই শুয়েছিল··· ধামসা বাজছিল সারারাত ধরে···আর সেই কান্নার গান···গোবধে ঢুকতে বিরাট গাই-বাছুর ফেস্টুন আর অন্য প্রার্থীদের পোস্টার দর্মার গায়ে, রোড সাইনের গায়ে মাটির দেওয়ালে লেখা বামফ্রন্টের শ্লোগান। অনিলবাবু দেখলেন—ইন্দিরা গান্ধীর মুখ-ছাপা পোস্টারের ফাঁকে তাঁর নাম দেখা যাচ্ছে।

বাচ্চা ছেলেটা বুঝতে না পেরে তার কাকাকে ডাকে আর জিপটাকে ঘিরে ভিড় জমতে শুরু করে। তার কাকা অনিলবাবুকে নমস্কার করে আর একটা পা—সরু লাঠি হাতে বড় ছেলেকে বুড়া কাহারকে খবর পাঠায়—নিজে নড়ে না। আরো ভিড় জমে লোকসভার সদস্যকে দেখতে। এরা এম এল এ চোখে দেখে না, এম পি তো দূরের কথা। সারা গ্রাম উজাড় করে মানুষ আসে। অনিলবাবু খালি নমস্কার করেন···দুজন মাঝবয়সী লোক অনিলবাবুকে প্রণাম করে ও পিতৃপরিচয় দেয়···আজ্ঞে···বাবার কাছে কত শুনেছি··· অনিলবাবু সহজেই চিনতেই পারেন। "বুড়া আবার এতটা আসবে কেন···চল না···আমরাও এগোই।" নিচু ঘর থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসে। অনিলবাবু তাদের নমস্কার করেন। বাচ্চাদের বড়রা সরায়। ড্রাইভারকেও বাচ্চারা অবাক হয়ে দেখে। ইস্কুল মাস্টার কমরেড এইসব দেখে খুবই অভিভূত হয়। "এত বড় রাস্তা আসচেন··· একটু জলপান করুন···।"

"সে হবেখন, আগে কাহারকে দেখি···বুড়া কি মনে রেখেচে আমায়।"

মানুষ কখনো কিছু ভোলে না। কাহার গতরাতে বড়শি ফেলে, রেখেছিল শোলমাছ ধরার জন্যে—টানসুতোর বড়শি। মাছ খায়নি। বড়শিটা দামের মধ্যে খুঁটি বা কিছুতে গেঁথে গিয়েছিল। পায়ে শামুকের খোলা, ধারালো টিন বোধ করে করে কাহার জলে নামছিল। তার এখন এক ছোট ছেলের বউ ছাড়া কেউ নেই। ছোট ছেলে অন্য মেয়ে নিয়ে সদরে চলে গেছে। কাহার কোমর জলে। তখন সেই সরু-পা ছেলেটা পাড়ে এসে চেঁচায় "দাদু··· দাদু··· শহরের বাবু এসেছে, তোমায় খুঁজছে···বুড়া কাহারকে খুঁজছে।"

"শহরের বাবু? পুলিশ?"

"না পুলিশ না। ভোটে জিতেছে বুড়োবাবু সেই তোমাকে দেখতে এসেছে···গাড়ি

চড়া।"

"হায় ভগবান! রাজাবাবু, অনিলবাবু আসছে···!"

তাড়াহুড়ো করে উঠে আসতে গিয়ে কাহার পা হড়কে একবার জলে মুখ থুবড়ে পড়ে। খোঁচা খোঁচা শাদাচুল আর দাড়ি—ভুরুর চুলও শাদা—ভিজে লেপটে থাকে—চোখে ভালো দেখে না বুড়া আর কোটরের মধ্যে চোখ ঘষা ঘষা—দিনে যা ঝাপসা রাতে তা আন্দাজে ঠাওর করতে হয়। উঠে আসে জল থেকে। উঠতে ছেলেটা কাহারকে বলে, "দাদু, গাটা মুছবে না?"

"হাওয়ায় মুছে যাবে—চলিস দেখি"—কপালের শিরাগুলো ফোলা আর সারা গায়ে চামড়া কুঁচকে ভাঁজ পড়েছে—জোরে নিঃশ্বাস নিলে পাঁজরাগুলো পিঠের দিকে চামড়া ফুঁড়ে বাইরে আসতে চায়—কাহারের উঠোন ছাড়াতেই অনেক লোকের মুখোমুখি হয় বুড়া···মানুষ কখনো কিছু ভোলে না···অনিলবাবু একটু ঝুঁকে পড়েন—

"কেমন আছ বুড়া?"

"আপনি কেমন আছেন রাজাবাবু? আমি এই বেঁচে আছি—এমনি আছি।"

বুড়া কেঁদে ফেলে এবং দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে অনিলবাবুর গায়ে জল লাগে। কাহার অনিলবাবুর মুখটা ধরে মুখের কাছে নামিয়ে এনে দেখে।

"আমি জানতাম এই হতে হবে—এই হবার—এই গাঁয়ে ফরমানের বাড়ি আর ওর কুত্তাগুলো ছাড়া সবাই আপনাকে ভোট দিয়েছে।"

"ফরমান মানে দৌলতের বেটা? দৌলত বাঁচা না মরা?"

"মরা—মরলে কি হবে···ফরমানকে রেখে গেছে—ওটা তো বাঁচা।"

"ওর বাপ খুব জ্বালাতন করেছে যা হোক। সবকিছু এবার পালটে দিতে হবে। পালটে যাবে। বুঝলে বুড়া। এমন ক্ষমতা তো আগে কখনো হয়নি। এবারে একেবারে পুরো জয়। তবে সময় লাগবে। হুড়োতাড়া করার দিন নয়। বুঝলে না?"

"আপনাকে একটা জিনিশ দেখাই রাজাবাবু। আসেন। কেউ জানে না।"

অন্যরাও আসতে চাইছি। তাদের বুড়া যেতে দেয় না।

"রাজাবাবু ছাড়া কেউ আসবেনি।" সবাই দাঁড়িয়ে বুড়ার ক্ষ্যাপামি দেখে।

"আসেন। আসেন।··· ইসরে···কাদায় পা দিবেন না। কাদা আর ছাই। তার সঙ্গে মিশে রয়েছে ভাতের ফ্যান আর পচা পানা। কাহার অনিলবাবুকে ঘরের পেছনে জলার দিকে নিয়ে যায়। একটা ভাঙা লোহার খুরপি নিয়ে ছাই-মাটি সরাতে একটা পচা কাঠের তক্তা দেখা যায়। তক্তাটা ধরে চাড় মেরে মেরে আলগা করে কাহার আর ছাইমাটি ছেড়ে একটু ফাঁক হতে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে নিচের গর্তে হাত ঢুকিয়ে একটা মাটি-মাখা লম্বা জিনিশের গোড়াটা বাইরে আনে। বন্দুকের কুঁদোর কাঠটা পচে গেছে। ফুটো ফুটো। ভেতরে খচ খচ করে শব্দ হয় আর মাটিতে ঠুকলে উইপোকা আলগা হয়ে বাইরে পড়ে এদিক ওদিক যায়। নখের মুখটা মাটি জমা। সারা গায়ে এবড়োখেবড়ো হয়ে মাটি জমে আছে। মাস্কেট।

"গুলিও আছে···দশটা গুলি আছে···আরো নীচে··· আমি জমা দিই নাই রাজাবাবু। যেদিন আপনার রাজ হবে সেদিন দিব। ফরমান জানে না। মনে ভাবে তল্লাটে ওর একার বন্দুক আছে। আপনি বলেন তো আমি আবার ক্ষেপে যাই। আমার তো কেউ নাই। লোকে বলে বুড়া ক্ষ্যাপা।"

"সেই তিনটা কাড়া বন্দুকের একটা এটা বুড়া?"

"তো কি? সেই বন্দুক। আপনি নিবেন?"

"না। তুমি বরং ওটা লুকিয়ে রাখো কাহার। সত্যি কথা বলতে আমাদের রাজ এখনো হয়নি যে!"

"তো এইটা কি হল? রাজাবাবু কি জিতলেন?"

"জিতলাম ভোটে। সামনের বার যদি হেরে যাই।"

বুড়া কাহারের মাথায় অতশত আসে না। তার বুকে ছাই মাটি। তাকে শিবের মতো দেখায়। বন্দুকটাকে কাহার গর্তের ভেতর দেয়। তক্তা আড়াল করে ছাই আর মাটি হাত দিয়ে টেনে এনে চাপা দেয়। তারপর পা দিয়ে মেরে মেরে শক্ত করে।

"আমার কেউ নাই রাজাবাবু। আর মরা তো আর কম দেখলাম না। আর বাঁচতে ইচ্ছা নাই যে। দুইটা ব্যাটা, ভাই গেছে গুলিতে, বউ নাই, কেহ নাই। এই ছোট ব্যাটার বউ আছে। কি করি?"

"কি করবে বুড়া? বাঁচবে। বাঁচতে হবেই। সেই দিন মনে আছে বুড়া? সেই জোরে বাঁচতে হবে। আমারই বা কি আছে বল?"

সম্ভবত অনেক কথা মনে পড়ে বলে বুড়া কাহার কাঁদে। সবাই দেখে। কলাইকরা কাপে গুড় দিয়ে বানানো চা আনে একজন অনিলবাবুর জন্যে। বুড়ার ঘরটা পেছনের জলাটার দিকে হেলে গেছে। অনিলবাবু চা ভাগ করেন। পাতার ছাউনি ফাটা-ছেঁড়া।

অনিলবাবুর যাওয়ার সময় এসে যায়। উনি আবার সবাইকে নমস্কার করেন। ওঁর পাশে পাশে বুড়া কাহার চলে মাটি দাবড়ে দাবড়ে। সেই পা-সরু লাঠি হাতে রোগা ছেলেটাও চলে। চলে আর সবাই। আর লোকের মাথায় চলে বিশাল এক কাঁঠাল। বুড়া কাহার এবার চারটি বড় কাঁঠাল ফলিয়েছিল। তার মধ্যে দুইটা গুয়োর ব্যাটারা চুরি করিয়াছে। একটি আগামীকাল বুড়া হাটে বিক্রি করিবার জন্য সঙ্গে নিবে। তখন এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই কাণ্ডই এই কাহিনীর উপসংহার।

বুড়া কাহার জিপে কাঁঠাল উঠাইতে গিয়া দেখিল একটি বড় ঝুড়ি রাখা আছে। সেই ঝুড়িতে চারটি বড় আনারস আর দুইটা বড় কাঁঠাল। এবং লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি গায়ে নালিশ ড্রাইভারের সহিত সিগারেট টানিতেছে ও একই মস্করায় দুজনে হাসিতেছে। বুড়া প্রশ্ন করে, জানিয়াই প্রশ্ন করে—"এই ঝুড়ি কার?" নালিশ সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায়—"ফরমান আলীর ভেট—নতুন এম পি গাঁয়ে এলেন, গাঁয়ের মালিক ভেট পাঠিয়েছেন।" নালিশ অনিলবাবুকে নমস্কার করেন—"স্টেশনের কথাটা একবার উঠাবেন সার, সবাই ধন্য ধন্য করবে।" বুড়ার কথা সবকিছু ছাপাইয়া উঠে—"ফরমান? জোতদারের ভেট কমরেড চায় না। নামাই দে।" নালিশ —"ফরমানের অপমান গাঁয়ের অপমান। বুড়া, জবান সামাল দাও।" ইস্কুল মাস্টার চটে ওঠে—"গাঁয়ের মালিক বললেন কে আপনি? মালিক-ফালিক কিছু নেই। শাসাচ্ছেন যে।" কাহার আবার চেঁচায়—"নামাই দে বলি।" কেউ আসে না। টান মারিয়া কাহার জোতদারের ঝুড়ি ফেলিয়া দেয়। আনারস, কাঁঠাল মাটিতে গড়ায়। "ফরমানের ফল এ জায়গায় যায় না। সর্বনাশের ফল, মড়কের ফল।" ফরমানের ফল মাটিতে গড়ায়। নালিশ আর বাক্যব্যয় না করে সাইকেল ছোটায়। ভিড় ফাঁক হইয়া নালিশের সাইকেলকে জায়গা ছাড়িয়া দেয়।

অনিলবাবু বুড়াকে বিদায় দিয়া জিপে উঠেন। "তা মাথা গরম করেছ, ভালো করেছ বুড়া। গোলমাল হলে সদরে একটা খবর এনো। লোক যে ভালো নয়।" ইস্কুল মাস্টারটি বলে,—"হ্যাঁ, সদরে চলে আসবেন। পার্টি অপিসে অমূল্য বললেই চিনবে।" বুড়া

কাহার বলিলে কেহ চিনিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। পেট্রলপোড়া ধোঁয়া ছড়াইয়া জিপ চলিয়া গেল। দলা পাকানো শক্ত পাথর পারা মাটিতে লাফাইতে লাফাইতে। গোবধের মানুষ জিপকে হাত নাড়ে। বুড়া কাহার হাত নাড়ে, পা-সরু লাঠি হাতে ছেলেটিও হাত নাড়ে। বহুদূরে ধূলার পাক ওঠে ও জিপ অদৃশ্য হয়।

একটানা ঝড়ঝড় শব্দ।

"দাও দেখি একটা সিগারেট তোমার।"

ইস্কুল মাস্টার তাড়াতাড়ি চারমিনার, দেশলাই বার করে।

"আপনি সিগারেট খান?"

"খাই আর কই? মাঝে মধ্যে এক দু টান—নেশা তো, অভ্যেস বাড়িয়ে লাভ কি বল?"

হাত মুঠা করিয়া খুব জোরে টান মারেন অনিলবাবু। ফেরার রাস্তা ফুরায় তাড়াতাড়ি। হঠাৎ তাঁহার মনে হয় যে বুড়া কাহারের সহিত আর তাঁহার কখনো দেখা হইবে না। তিনি চলিয়া যাইবেন কলকাতা, দিল্লি, আরো কি কি সব জায়গা। কত আলোচনা, কত কাগজ, কত কাজ। আর হাজার মাইল দূরে কোথায় অন্ধকার মাঠে বুড়া কাহার ওই ত্রিশ বছর আগে কাড়িয়া লওয়া মাটি জমা অকেজো বন্দুক আর দশটা অচল কার্তুজ হাতে ছেলে, ভাই ও অন্য সব লাশ পাহারা দিবে। জোনাকি জ্বলিবে। জোনাকি মরিয়া যাইবে অন্ধকারে আলো ফুটাইতে ফুটাইতে। ঘোলানদী থইথই করিয়া ফাঁপিয়া উঠিবে। সেই ঘোলাজলে চিতার আলো পড়িবে। নদীর পাড়ে আটখানা চিতার মাথার কাছে বুড়া কাহার যুগযুগান্ত বসিয়া থাকিবে। আর কখনো তাঁহাদের দেখা হইবে না। অনিলবাবুর খুব কষ্ট হইল। তাঁহার মনে হইল গাড়ি ঘুরাইয়া যান। বুড়ার সঙ্গে অনেক গল্প করেন। কি দরকার দিল্লি যাওয়ার? আচ্ছা, শহিদ পরিবার বলিয়া বুড়া-র জন্য একটা মাসোহারার চেষ্টা তো তিনি করিতেই পারেন। অনিলবাবু এইটা করাই মনস্থ করিলেন। বড় দুঃখে আছে। জিপ সেই দু রাস্তার মোড়ে এসে পাকা রাস্তা পায় ও ঝড়ের বেগে চলে। জিপের উপরে ঝাণ্ডা পতপত করিয়া ওড়ে।

রাতে এক পশলা বৃষ্টি হইল। তাই মানুষের পায়ে পায়ে সাতরাজ্যের কাদা। আট দশ গাঁয়ের হাট বলিয়া ভিড় হয়। হলুদ সবুজ বোতলে সাজানো সরবতের গাড়ি। সেই গাড়ি ঘিরিয়া শিশুদের জটলা। সদর হইতে সরকারি লটারির টিকিট বেচিতে আসিয়াছে। উহারা ব্যাটারি-মাইকে গান বাজায়; ছেলেরা গলা মেলায়।

"বোম্বাইসে আয়া মেরা দোস্ত
দোস্তকো সালাম করো"

বাঘ পড়ার মতো করিয়া উহারা হাটে ঢুকিতে মেয়েরা সভয়ে দুধারে পালায়। নিজেদেরই মত্ত পায়ের কাদা উহাদের নিজেদের মুখে ছিটকাইয়া লাগে। উহারা কিছুক্ষণ একটি মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া খামচায় এবং মেয়েটির শিশুপুত্র তাহার মাকে মারিতেছে ভাবিয়া চেঁচায়। মেয়েটিকে দঙ্গল ছাড়িয়া দেয়। তাহারা ইচ্ছামতো দোকান হইতে ফল তুলিয়া কামড়ায় ও সেই এঁটো ফল আবার ঝুড়িতে ফেলে। তাদের কপালে সিঁদুরের ফোটা ও মুখে পচাইয়ের গন্ধ—নালিশ, আনোয়ার, কাত্তিক, কোচে, পাখট—বুড়া কাহারকে তাহারা চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে।

"শালা বুড়া—এইবার কোন বানচোত বাঁচায়?"

কাহার চটের তলায় চাপা দেওয়া কাটারির ওপর পা রাখিয়া ঝাপসা চোখে দেখে

পাখট তার কাঁঠালটি নিয়া কাঁধে ওঠায় ও কাদার ওপরে হড়্কাইতে হড়্কাইতে গিয়া সাইকেল রিকশায় তোলে এবং সাইকেল রিকশায় ফরমান। সে কাহারের কাঁঠালের ওপরে পা তুলিয়া দেয়। ফরমানের অঢেল জমি। তবু সে কাড়িয়া খায়।

"রাত ভর খাও পিও
দিন ভর আরাম কর"

সহসা বুড়া কাহার চটের তলা হইতে কাটারি বার করিয়া ব্যূহ ভেদ করিয়া রাস্তায় কাদায় নামে এবং মুখে হাত চাপা দিয়া ছেচল্লিশের রক্ত হিম করা আওয়াওয়াওয়াওয়া ডাক দেয়। এই ডাকে তখন কত মানুষ সাড়া দিত। হাটভরা লোক নিস্পন্দ পুতুল। শুধু মাইকের গান বাজে। কাত্তিক মালের ধুনকিতে বুড়ার হাতে কাটারি খেয়াল করে নাই। সে কাহারের দিকে লাথি চালায় ও পায়ে কাটারি গিথিয়া কাদায় পড়িয়া ছটফট করে। থোড়ায় কাটারির ফলা বসিয়া গিয়াছে। কাত্তিকের পা দিয়া গলগল করিয়া রক্ত পড়ে। যাহারা কাছাকাছি ছিল তাহারা দূরে পালায়।

উহারা বুড়াকে কাটিবার জন্য মেছোদের নিকট হইতে বড় বঁটি আনিতেছিল। ফরমান কাটিতে বারণ করে—"মার···শালাকে লাথি মার··· মার··· লাগা লাথি।"

তাহারা বুড়া কাহারকে মাটিতে ফেলিয়া একের পর এক লাথি মারে। কাহারের কানের পাশে লাথি লাগে, দাঁত ভাঙিয়া যায় ও মাথা ফাটে লাথিতে। কাদা আর রক্ত তাহার সারা শরীরে লাগে ও মুখে মাখামাখি হয়। কাহার পাঁজরায় লাথি খাইয়া কাত ফেরে। পিঠে লাথি তাহাকে উপুড় করিয়া দেয়। আবার চিত হয় কাহার। মুখে হাত চাপা দেয় বুড়া। পেটের উপর গোড়ালি দিয়া তাহারা দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। উহারা বুড়ার কাপড় হিঁড়িয়া কাড়িয়া ন্যাংটো করিয়া দেয়। নালিশ কাহারের দোকানের চটের ওপর পেচ্ছাপ করে। হাটের লোকজন দূরে। নালিশ ও তাহার দলবল কলরব করিতে করিতে চলিয়া যায়। তাহাদের আগে আগে যায় ফরমানের সাইকেল রিকশা। বুড়া কাহার দাঁড়ায়, গতকাল যাহাকে দেখিতে একজন লোকসভার সদস্য আসিয়াছিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া বুড়া একা একাই যুদ্ধের ডাক দেয় ও সকলের দিকে তাকায়। ন্যাংটো ও রক্তমাখা বুড়া কাহার তাহাদের বলে—"চলে গেলি কেন? আয় শালারা আয়···আমার পুঁজিপাটা কে কাড়বে রে—কোনো মায়ে এখনো অমন মরদের জন্ম দেয় নাই—কোন শালা কাড়বে? এ পুঁজিপাটা কেউ নিবার পারবে না—কেহ না—আশমান আমার পুঁজিপাটা—কাড়বি? আয় শালা শুয়ারের বাচ্চা—জমিন আমার পুঁজিপাটা—নিবি? আমি তো শালা জমিনের মধ্যে ফুঁড়ে ঢুকে যাব—কি কাড়বি আমার—ক্যামনে কাড়বি? আয় শালারা···আয়···কেউ তো নাই আমার, কেউ নাই···খেপে যাব···আমি আবার খেপে যাব—আয়···আওয়াওয়াওয়াওয়া"—রক্ত আর লালার সঙ্গে ভাঙা দাঁতের কুচি বুড়া থুতুতে ছিটায়।

একটা বাচ্চা ছেলে এসে বুড়া কাহারকে একটা গামছা পরায়। ব্যাটারি মাইকে গান বাজিতেছে। এমন সময় একটা পুলিশের ভ্যান আসিয়া থামে। ফরমান আগে থাকিতে খবর পাঠাইয়া রাখিয়াছিল। দারোগা আর তিন বন্দুকধারী কনস্টেবল। কাদায় তাহাদের ভারী বুটে খপখপ শব্দ হয়। বন্দুকগুলি দোলে। কোমরে বেয়নেট। বুড়া কাহারকে তাহারা হাটে কাটারি নিয়া মারদাঙ্গা করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া গেল।

১৯৭৯

ফোয়ারার সেই মানুষজন

গত দুদিন ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ছিল তাই সামনের খোলা ড্রেনটার ওপরে ঢেউ খেলানো শ্যাওলার চাপ আর নোংরা পচা জল একেবারে দোকানের ভেতরে এসে আমার পায় ঠেলা মারছিল। মুখে মদ ছিল বলে গন্ধটা আমি পাইনি। মধ্যে মধ্যে মাছের ঝাঁকের মতো এক দেওয়াল ওপারে গলিতে দাঁড়ানো মেয়েগুলোর হাসি শোনা যাচ্ছিল। ওখানে ফোয়ারা বলে একটা মেয়েকে আমার খুব ভালো লাগে। তাই পাঁইটটা শেষ করে দেওয়ালে মাথা রাখতে যাচ্ছিলাম তখন জলকে ডাঙা ভেবে একটা বেঁটে লোক ঝপাং করে ড্রেনের জলে এক পা দিয়ে পড়ল। মেয়েগুলো মজা পেয়ে খুব হাসল। লোকটা উঠছে না দেখে গিয়ে লোকটাকে তুলে দেখি ভারী লাগছে। হ্যাঁচকা মেরে দোকানে আনলাম। জল ছিটকোল। হাঁটুর ওপরে ছাল ছিঁড়ে গুটিয়ে শাদা দেখা যাচ্ছে। ঠেক মালিকের ছেলেকে দিয়ে চুন আনালাম। লোকটা কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে হাসিমুখে বসে থাকল। তারপর চুনটা ঠেকাতে মুখ কুঁচকোল। আবার হাসিমুখ করে থাকল। চোখ দুটো খুলে আমাকে দেখে নিয়ে বলল:

—সবকিছু এইভাবে সাইজ হয়ে যায়। বুঝলেন?

—আবার মালের দোকানে আসা কেন? এমনিই তো কথা হড়কে যাচ্ছে।

—বাঃ, আজকে চার তারিক না? মাইনের দিন আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। কেমন সাইজ হয়ে গেল দেখলেন? পড়ে গেলাম, আপনি তুলে নিলেন। কিছুই পড়ে থাকে না। আমি না। খুকী না। কেউ না। সব সাইজ হয়ে যায়। একটা বোতল আনাই। ভালো কথা কিন্তু লোকটা আবার মুখ কুঁচকোলো।

—ও কিছু না। চুন এখন ধরছে বলে জ্বলছে।

—ও ঠিক সাইজ করে নেবে। ছাল নিয়ে নিলে চুন। চুন নিয়ে নিলে ওষুধ আছে। একটা ওষুধ আছে বাড়িতে বুঝলেন। ধন্বন্তরি। আমার ওয়াইফের অপারেশনের পর দিয়েছিল ঘা শুকোবার জন্যে। শুকোবার আগেই তো মরে গেল।

—সেই জন্যে মাল টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? ঘরে কেউ নেই? একটা বিরাট পাঁইয়া

বেরোবার মুখে বেঁটের পায় হোঁচট খেল বলে ছাল ওঠা আবার চোট খেল। পাঁইয়াজিকে খিস্তি করলাম। চুন ভিজছে রক্তে। ছালের তলায় শাদা আছে। শাদার তলায় রক্ত। তার তলায় হাড়।

—ঘরে কেউ নেই?

—বললাম যে খুকী আছে। আমার মেয়ে। বলেই লোকটা আমার মুখের ওপরে হাতের আঙুল নাচাতে লাগল।

—কি হল আবার?

—কথা বলছি আমার মেয়ের সঙ্গে। ও তো বোবা। তাই সব কথা এরকম করে হয়। বড় ভালো মেয়ে বুঝলেন। বাড়িটা সাইজ করে রাখে।

—তা মাল টেনে নালা-নর্দমায় না গড়িয়ে বাড়ি চলে যান না কেন? বোবা মেয়ে ঘরে একা।

—তাই তো যাই। ঢালুন। বেশি ঢাললেন আমাকে। পয়সা দিচ্চি, তাই? দিন। রোজ তো বাড়ি যাই। মা মরা বোবা মেয়ে ঘরে। যা দিনকাল।

রাস্তার ওপার থেকে হল্লা আর তড়কার গন্ধ আসছিল। একটা বাস ঠেলে বেরিয়ে গেল। ফোয়ারাদের হাসিতে বাসটা উলটে যেত। দোকানের মধ্যে সবগুলো লোক কাটা পেঁয়াজের মতো কালচে হয়ে রয়েছে নেশায় ঘামে হ্যাজাকে।

—অমন অশৈল হাসছে কারা বলুন তো?

—ও কতগুলো খানকি। মাগীঘর রয়েছে পাশে।

—হাসচে? মেয়েমানুষ! কি আচে বলুন তো ওই হাসিতে? ইচ্ছে চাগবে। তারপর গ্যাঁজগ্যাঁজানি বেরিয়ে গেলেই—কিচ্ছু জন্মাবে না। খুকী জন্মাবে না। আমার বউটাই শালা মরে গেল।

—থাকেন কোথায়?

—বোড়াল। এই গড়িয়া হল লাস্ট স্টপ বুঝলেন। লাস্ট মালের ঠেক। সেই খেতে খেতে আসচি। খাওয়াচ্চি।

—চাকরি করেন ঠিক। সার্ভিস?

—চাকরি?

বেঁটে ঝুঁকে পড়ে। ওর বুক পকেটে অনেক টাকা।

—আজ মাইনে দিল। ওই মাইনের দিনটা শুধু। খুকী জানে আজ ফিরতে দেরি হবে।

—টাকাগুলো ভিজে গেচে।

—অ্যাঁ! তাহলে শুকিয়ে নিই। কি বলেন?

লোকটা মুখ কুঁচকে পা নামায় জলে। তারপর বুক পকেট থেকে টাকা বের করে। ভিজে এক তাড়া নোট।

টেবিলের ওপর ন্যাতা টাকা সেঁটে সেঁটে দেয়। বোতল, খালি পাঁইট, গেলাশ দিয়ে চাপা দিই। ঢুকতে বেরোতে লোকে দেখে। গুরু, রোদে দিয়েচ? জবাব দিই না। তিনশো টাকার ওপরে দশ দুটো, পাঁচ।

—এই টাকা বুঝলেন স্রেফ হকের রোজগার। মেয়েটার জন্যে ফেবারিট করে দিয়েচি। এক হাজার টাকার। বলুন খারাপ রেখেচি?

—না ভালোই তো।

—আসলে সব সাইজ হয়ে যায়, বুঝলেন? আমার শালা বউটাই মরে গেল। গ্যাল

ব্লাডার। ডাক্তার বলল চামড়া জুড়ে গেচে। অনেক লেট হয়ে গেচে। শেয়ালদায় বুঝলেন—বউ মরে গেল। একটা টাকা ডাক্তার রেয়াদ করল না। শালা। আমি সার্ভিস করি। কারো খাই না পরি না। খাও দাও ওড়াও কম্বল, যাবার সময় ধনটুকু সম্বল।

—যা বলেচেন।

—আমরা খুব ভালো আচি বুঝলেন। মেয়েকে নিয়ে বেড়াই। বউ যখন ছিল···

ন্যাবা এসে আমাকে বলল ফোয়ারা কিন্তু এবার আর বরদাস্ত করবে না। দুজনকে ফিরিয়েছে। ন্যাবাকে বললাম ফোয়ারাকে পাঁচ টাকা দিয়ে দিতে। ন্যাবা বলল তার পকেট ফোঁফাঁ। তখন টেবিল থেকে সাঁটা পাঁচ টাকার নোটটা খুলে আমি ন্যাবাকে দিলাম। বেঁটে দেখল।

—বউ যখন ছিল খুব বেড়াতাম। লেকে গেচি। ঝোলাপুলের তলায় মাছ। কি ফাইন সিনারি বলুন। নৌকো বাইচ হচ্ছে। তারপর বুদ্ধদেবের মন্দির। কি একটা ধূপ জ্বালে জানেন।

—কোথায় মন্দির?

—ওই লেকের ধারেই। দেখেননি? যাবেন ঠিক। তারপর দমদম। ময়দান। যাদুঘর। উড়োজাহাজ—একটা দেখবার জিনিশ বলুন। সেই তো খুকী হওয়ার এক মাস আগে চিড়েখানায়। সদ্য তখন শাদা বাঘের বাচ্চা হয়েচে। বুঝলেন? তাই দেখতে দিল না। তারপর সমুদ্র।

—সমুদ্র?

—জানেন না? একবার না অফিসে বন্ধুদের কাছে শুনে গিয়ে ধর্মতলায় দীঘা বাসের টিকিট করে আনলাম। ও তো ভয়ে কাঁটা। সমুদ্র কখনো দেখেনি যে। আমার ছোটবেলায় পুরী যাওয়া আছে।

—কি দেখলেন?

—ভগবান। শুধু জল মশাই। উঃ কি কাণ্ড। খুব দারুণ হয়েছিল জানেন। দেখবেন? কি?

—দীঘার ফটো। দোকানে তোলানো।

বেঁটে পকেট থেকে একটা রেক্সিনের ধার ছেঁড়া ব্যাগ বের করল। খুলল। একটা ময়লা ফটো। বেঁটেকে বেশ দেখাচ্ছে। তখন গোঁফ ছিল না। পাশে একটা রোগা মেয়ে। কোলে খুকী। আরো রোগা।

—কদিন আগেকার?

—তিন বছর। ও চলে গেচে তা এক বছর। কি বলছি দেড় বছর হয়ে গেল। নেশা হয়ে গেছে। অনেক খেয়েছি তো?

বেঁটে লোকটার জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কটা টাকা মাইনে পায়। কত টাকা খাইয়ে দিল। বাড়িতে বোবা মেয়ে। বউটা মরে গেছে। খুব বেড়াত। বেঁটের কথা শুনছিলাম। বেঁটের কথাই ভাবছিলাম? পরেশ, জহর আর কাশেম এল। ওরা শশা কিনেছে, মাল কেনেনি।

—গুরু, মালটা কে? মাল খাওয়াও গুরু।

আমার তখন খুব দরাজ লাগছিল। এতগুলো টাকা সামনে সাঁটা যখন বেঁটে প্রায় যাবে না আসবে।

—গুরু, দাদা কে?

—তোদের কোনো দরকার আছে?

—সে কি বে?

আমি দুটো দশ টাকার নোট খুলে ওদের দিলাম। শালারা ভেতরে গেল। বেঁটে দেখল। একটা নোটের কোনা ফরফর করছিল। আলগা আঙুলে লেগে নেমে জলে ভাসল।

—উড়ে যাচ্ছে। টাকা উড়ে যাচ্ছে।

—চেপে বসুন তো।

—উড়ে যাচ্ছে টাকা। তুমি তুলে দেবে• ভাই?

—দিচ্ছি।

—আমি এবার চলি ভাই। খুকী ঘুমোবে না।

—একটু তড়কা রুটি খেয়ে যান।

—খুকী ছাড়া আমি খাব না। না ভাই আমি গিয়ে ভাত ফোটাব।

বেঁটে নোট খুলছিল। খোলো। ওদিকে যে তিনটে নোট সাইজ হয়ে গেল।

—আমি ভাই উঠি।

—জামা শুকিয়েচে?

—আর জামা। বউটা মরে গেল তাই। সাতদিন এক জামায় আপিস। উঃ

—পায় লাগচে?

—চুনে মরবে? নোংরা জল। ওই ওষুধটা একবার লাগিয়ে নেব বলুন।

—লাগাবেন।

—তুমি কি করো ভাইটি তো বললে না।

—আমি? আমি করি ফোয়ারা।

—ফোয়ারা?

—ওই এক্সপোর্ট ইমপোর্ট।

—আরে শালা ন্যাবা। ন্যাবাকে ডাকলাম। জহর, কাশেম, পরেশ, বিনোদ সবাই এল।

—গুরুকে নদ্দমা টপকে নিয়ে যা।

বেঁটে দেখল ও উঠছে। নীচে নোংরা কালো ঢলানো শ্যাওলার চাপ আর জলপচা। বেঁটে দেখল চার বেহারা তাকে উড়িয়ে এনে কাদা মাখা রাস্তায় দাঁড় করাল। ন্যাবা রিকশা থেকে নামল। শালা খুব কথা শিখেছে। দাদু আপনি উঠুন।

আমি বেঁটেদার হাতে রুটির ঠোঙা দিলাম। পার্সেল তড়কার ভাঁড় দিলাম। খুকীর তড়কায় ঝাল লাগবে বলে মিষ্টি দিলাম। তারপর দুটো দশ, পাঁচ আর আমরা দুজনে খেয়েছি দশ আর খাচ্চে খাওয়াচ্চে বিশ—গোল করে দিয়ে ষাট বেঁটের পকেটে দিলাম আর এক ছোট শিশি লাল ওষুধ।

—ভাই! ভাই!

—গুরুকে বোড়ালে পৌঁছে ফিরে এসে হরেনের পানের দোকান থেকে ভাড়া নিবি। যতক্ষণ না বাড়ি পাবি খুঁজবি। ঘরে তুলে দিয়ে আসবি। এদিক-ওদিক হলে চামড়া তোলার দরকার হবে না কারণ এদিক-ওদিক হবে না।

—ভাই! তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নামে লোকে পুলিশ পোষে। নাই আর জানলেন।

—ভাই?

—হ্যাঁ, ভাই।

বেঁটে ঝুলচে। এরপর তড়কার ভাড় পড়বে।

—বলুন···

—বলো আসচে মাসের চার তারিকে তুমি আসবে। মাইনের দিন। তুমি তো জানো আমি অন্যদিন খাই না।

—আসব।

কিচ্, ট্যাঙাড় টিঙ টিঙ টিঙ রিকশা চলে গেল। ভাই! ভাই!

—গুরু, নাটাদা কে এবার বল?

—বলো গুরু?—

—আমার বাবা।

ফোয়ারার কাছে গেলাম। বৃষ্টির ঠাণ্ডায় তুই ঘামছিস? ইস্ পাঁচটাকা ঠেকিয়ে খুব পালিয়ে বেড়াচ্চ, না? ঢ্যামনামি করিসনি ফোয়ারা। খাও দাও ওড়াও কম্বল। দেয়ালের ইট পিঠে ফোটাচ্ছ কেন গো? ভেতরের জামার টিনে পিঠ কাটছে। আমার ঘরে যাবে না? যাব না। পরের মাসের চার তারিখে আমি ছিলাম না। মাসের গোড়াতেই বিড়িরা আমাকে ঘরে তুলে নিয়েছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ খাকি পরে। ফোয়ারার তখন কি হল? চার তারিখের কি হল? খুকী, এই দ্যাখ্ গরাদের ছায়ার মতো আমার আঙুলগুলো তোকে বলছে আমি জেলে।

১৯৮৬

ফেয়ারার জন্যে দুশ্চিন্তা

ফোয়ারার কথা এর আগে দুটো গল্পে আমি রটিয়েছি। কিন্তু বেশি কেউ জানতে পারেনি। জানার কথাও নয়। কারণ গল্পদুটো বেরিয়েছিল লিটল ম্যাগাজিনে। সেগুলো নিয়ে কেউ টিভি-র ছবি বা ফিল্ম—কিছুই করেনি। তাই কেউ জানতেও পারেনি। ফোয়ারাকে নিয়ে আমার এই তিন নম্বর গল্পও রুজপমেটম মাখা কোনো বড় কাগজে সায়া পরে বেরোচ্ছে না। অতএব কোনো আর্টিস্টকে ফোয়ারার ডবকা প্রোফাইল এবং চেম্বার হাতে হেকড়বাজ আমিটিকেও আঁকতে হচ্ছে না। এবারেও লিটল ম্যাগাজিন এবং এখানে কেউ যতদূর জানি আঁকাআঁকির মধ্যে নেই। তাই ফোয়ারাকে ফোয়ারার মতোই দেখাচ্ছে। আমাকেও আমার মতোই।

ভালো যে এখন আমার রোজগারের ব্যাপারটা অনেকটা সাইজ হয়ে এসেছে। পেটে চাড় পড়লে লোকে কানাবুড়োর পাঁউরুটি অব্দি ছেনতাই করে খায়। এখন আর স্টেশনের পাশে তোলা আদায় করি না। চোলাই বা ট্যাবলেটের ব্যবসার লাইসেন্স দিই না। কান্ট্রি বা ফরেনের বামাল সাপ্লাই করি না। ডাকাতির গাড়ি চালাবার উলটোপালটা কেস নিই না। মওকা বুঝে একটা ডিজেল ট্যাক্সি লড়িয়েছি। সকালে কড়কড়ে দেড়শো টাকা নিই। শুকনো গাড়ি নিয়ে যায়। আমার গাড়ি বলে যেই চালাক বুঝেসুঝে চালায়। রাতে গাড়ি হাজির। কোনো ঝুটঝামেলা নেই। ব্যাঙ্কের লোন ভরে দিলেই চল্লিশ পঞ্চাশে ঝেড়ে দেব। আবার গাড়ি নেব।

গুছিয়ে নেবার কারণ বয়স হচ্ছে। কাঁচা বয়সে চাইনিজ স্টেন হ্যান্ডেল করেছিলাম। লোকে চেনে। চলন্ত সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে গেছি, সাইকেল এগিয়ে গেছে। তার ওপর বোম চার্জ করেছে। দুমড়ে ঝলসে স্পোক মোক ছেতরে ছিটকে দলা হয়ে গেছে। এ মাল সহজে কেউ ঘাঁটাবে না। তবে এখন দম ছাড়ার সময়। অনেক দম দেওয়া হয়েছে। পুরোনো স্প্রিং বলে ফাঁকফোঁকরে একটু আধটু তেল খাওয়াতে হয়। এ এক জব্বর দুনিয়া। সিনার জোর, তাকত্, ধক, ঝাঁজ, ব্যাটারির চার্জ সব রাখতে হবে। খিল্লি করা চলবে না। দাম পড়ে যাবে। ভাট বকলে চলবে না। ইজ্জত বাঁচিয়ে মরচে বাঁচিয়ে

ছুরির মতো থাকতে হবে।

কিন্তু এখন আমার মধ্যে ধুকপুকুনি বেড়েছে। ভয় বেড়েছে। ফোয়ারা বেশ্যা কিন্তু সে যদি মরে যায় আমি পুরো নিলাম হয়ে যাব। ফোয়ারা এমন না যে ওর কথা ভাবলে আমার মধ্যে একটা ভাপ ওঠে। যে কোনো রাতের চেয়ে ওর চোখের কাজল আমার দেখা সব থেকে পালিশ করা অন্ধকার। ওর হাসি, ওর কথা, খুঁজতে খুঁজতে হাল্লাক করে দেওয়া ওর শরীর সব আমার নিজের। আমার হকের জিনিশ। কিন্তু এমন একটা অসুখ হয়েছে ফোয়ারার যে আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না। একবার রেগে গিয়ে ভেবেছিলাম এই নিয়ে তিন নম্বর লেখাটা লিখব না। পাব্লিক জেনে যাবে আমি ভয় খেয়ে গেছি আবার বাজারে যা দাম আছে ফোয়ারার সে দরও থাকবে না। আবার ভাবলাম, না। এ বছর একবারও ফোয়ারাকে কেউ ছাপেনি। ফোয়ারাদের ওই সার বাঁধা দরমার ঘর, রাস্তার কাঁচা নর্দমাটা পেরিয়ে স্যাঁতসেঁতে ছাইকাদা রাস্তা, রেডিওর গান, কেরাসিন পলতের আলো একবার শালা ভদ্দরলোকদের ঘরে ঢুকে পড়ুক। ফিনকি দিয়ে একবার ফোয়ারা খুলে যাক। কারণ যে অসুখ করেছে তাতে যদি ফোয়ারা মরে যায় আর সেই অসুখটা যদি আমার ও হয় আর আমিও মরে যাই তবে কে বলবে ফোয়ারার কথা? বিচারে কী বলে? আমি ধুড়ুয়া? ঘাবড়ে গেছি? কুঁই কুঁই করছি?

রঙের আলো পড়লে ফোয়ারাও রঙ ধরে। আলোর গুঁড়ো ওড়ে। পাউডারের মতো। যে পাউডার আমি ফোয়ারাকে কিনে দিয়েছি। আর যে লিপস্টিক কিনে দিয়েছি ফোয়ারাকে সেটার তলা থেকে প্যাঁচ দিলে ঘুরতে ঘুরতে বুলেটের মতো দেখতে ঠোঁট রাঙাবার জমাট মোম বেরিয়ে আসবে। উলটো প্যাঁচ দিলে আবার ঢুকে যাবে। ফোয়ারা শুকিয়ে যাচ্ছে আর লোক এত বড় এত বিদ্বান যে জানবেই না? আমার অব্দি চোখ জ্বালা করে। খালি ফোয়ারার জন্যে। গতবার কালীপুজোয় আমেরিকান জাহাজীরা ফোয়ারাদের গলতায় এসেছিল। অনেক টিনের মদ, চকলেট, টাকা দিয়ে গেছে। তারপর থেকেই ফোয়ারার সেই অসুখ। বেশ ছিল। শরীরও সেরে খোলতাই হচ্ছিল। কোথা থেকে যে হারামিগুলো এল। কবে যেন প্যাখনা ফুলিয়ে লিখেছিলাম "অপ্রকাশিত থাকুক লেখকের সঙ্গে ফোয়ারার সম্পর্ক।" এবার দেমাকের গোড়ায় শেকড় ছিঁয়ে গেছে। বেগুনের পাতায় ঝিমুনি এসে গেছে।

ফোয়ারার গাল ঢুকে যাচ্ছে। চোখ বসে যাচ্ছে কোটরের তলায়। থিতিয়ে যাচ্ছে ফোয়ারা। পাঁজর, কণ্ঠা ঠেলে বেরোচ্ছে। ঠোঁট শুকনো মেরে যাচ্ছে। চুল উঠে যাচ্ছে। অথচ এই ফোয়ারা যখন ঠমক দিয়ে গলির মুখে এসে দাঁড়াত তখন রিকশায় বউ পাশে ভদ্দরলোকেরা হাঁদা বনে গরমে যেত। বাসে, লরিতে টুকটাক ঠেকে যেত। না দেখে চালালে যা হয় আর কী। এরই উলটো-পিঠে সেই মাটির দেওয়াল, কাঠের জানলার বাংলার ঠেক। যেখানে সেই বউ-মরা মাতালটাকে ইজ্জত দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছিলাম দেদার রাত্তিরে। তার চেয়েও গভীর রাতে একবার সারা পিঠ পুড়িয়ে জামা জ্বালিয়ে ফোয়ারার খুপরিতে গিয়ে ঢুকেছিলাম। সেখানে একুশ দিন ছিলাম। বোমাটা ফেটেছিল পিঠের ওপর। পিঠে লেগে ফেরবার সময়। জামাটা জ্বলে গিয়ে পিঠ পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল আর বোমার ভেতরে যে বেয়ারিং-এর বল, পেরেক, কড়াই ভাঙা টুকরোগুলো ছিল সেগুলো দু-একটা ঘাড়ে লাগলেও বেশির ভাগই গিঁথেছিল কলাবাগানে। একুশ দিনের মধ্যে দশ দিন উপুড় হয়ে। বাবুলাল, ভৈরব, পাখি সব গিয়ে বিষ্টু ডাক্তারকে নিয়ে এল। বিষ্টু ডাক্তার বলল, "আমি মাগীদের ডাক্তার। পিঠ পোড়ার কী বা জানি। দিই ঠুকে

পেনিসিলিন। গনোরিয়া সারাচ্চি, এ তো ফালতু ফোস্কার ঘা।" আর দিয়েছিল শাদা মলম। কী ঠাণ্ডা!

পরে শুনেছি ছেঁড়াপোড়া নিয়ে ফোয়ারার কাছে আমার আগেও কয়েকজন এরকম থেকেছে। তারা পার্টি করত। একটা ছেলে পেটে গুলি নিয়ে তিনদিন ছিল। ধরপাকড়ের মধ্যে তার দলের কেউ আসতে পারেনি। সরানো তো দূরের কথা। ফোয়ারার চোখের দিকে তাকিয়ে সে মরে গিয়েছিল। ফোয়ারাও হয়তো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মরে যাবে। তারপর আমাকে কার চোখের দিকে তাকিয়ে মরতে হবে?

বিষ্টু ডাক্তারের চেম্বার কাঠের। ভিজে মাটি থেকে উই উঠে কাঠ ফোপরামাটি করে দিয়েছে বলে তলাটা খুঁটি বাদে কিছু নেই। খুঁটিতে আলকাতরা মাখানো। আলমারির মধ্যে ধুলো, মরা টিকটিকি আর খালি শিশি। বাড়িতে রাখে পেনিসিলিন আর ছুঁচ সিরিঞ্জ। ডাকলেই ওর একটা ন্যাবা ছেলে আছে সে দিয়ে যায়। ছেলেটার মুখ দিয়ে লালা পড়ে। বিষ্টু ডাক্তার গরমকালে গা খালি রাখে। একটা ছেঁড়াখোড়া কালো প্যান্ট পরে। বেশ মেজাজ গরম নিয়েই গিয়েছিলাম। ওষুধে কাজ না হলে ডাক্তারকে ক্যালাব। এই না নিয়ম। কিন্তু বিষ্টুডাক্তার আমাকেই দাবড়ে দিল। "আমি কী ব্রহ্মাস্ত্র দিইনি না লুকিয়ে রেখেছি যে র‍্যালা করচো। যকন যা বলেচো করিচি, ছুঁচ মারতে বাকি রাখিনি, হিশেব করিনি। এক লাখ, দু লাখ—কম তো আর ফুঁড়লাম না। আমার বিদ্যেতে আর ঢের কুলোচ্ছে না। পেসালিস্ট দ্যাকাও। আমাকে ঘর ছাড়া করলে ফোয়ারা সেরে উঠবে? দাও। মন চাইলে তাই করো। তোমাদের ক্ষ্যামতার অন্ত নেই। আমি বুড়ো, মাগীর ডাক্তার। পারব?"

"কে সে কথা বলচে আপনাকে। বলচি এই তো ইঞ্জেকশন দিলেন। কেস তো আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে! মাথা গরম করে ফেলেচি তা দুটো থাপ্পড় মারুন। কি করব বলবেন তো।"

"ভালো কতা বলচি। মেডিকালে নিয়ে যাও। মরুক্ষে রোগ ওরা ভালো বুঝবে।"

মেডিকালে বাবুলালের মাসী আয়া। ট্যাক্সিতে করে ফোয়ারাকে নিয়ে গেলাম কথাবার্তা বলে। ট্যাক্সিতে ফোয়ারা কাঁদছিল। ময়দানে গাড়ি থামিয়ে দিলাম।

"কান্না করার কী হল। হাসপাতালে ডাক্তার দেখলে সেরে যাবে। বুঝচো না কেন?"

"আমি মরে যাচ্ছি যে। চোখ ছাই ছাই দেখচে।"

"কী হাওয়া বলো তো। উড়িয়ে দিচ্চে।"

"গঙ্গা থেকে আসচে। কোন দিকে গো গঙ্গা?"

গঙ্গা ওই দিকে ফোয়ারা। ওই মাঠ গাছ পেরোলেই গঙ্গা। ফোয়ারা প্রণাম করে। আমার পিঠ পুড়েছিল বলে ফোয়ারা জেগেছিল। ফোয়ারাকে পোড়াতে হলে আমি আর জাগতে পারব?

এ বাঙ্গোত ছোকরা ডাক্তারও আমাকে চমকাল।

"ভিডি, ভিডি করে চেঁচাচ্ছেন কেন? একে এসটিডি বলে এখন। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিসিজেস। আপনার কে হয়?"

"আপনার দরকার?"

"দরকার কিছুই না। কেসটা সহজ নয়। আমরা পেসেন্ট টাইম নিয়ে দেখব। বোঝা যাচ্ছে না।"

আরো দুজন ডাক্তার আসে। তারা ফোয়ারার চোখ, জিভ দেখে।মাথায় যে যে

জায়গা থেকে চুল উঠে তেলাপোকায় খাওয়া খোবলা টাক পড়েছে সেগুলো দেখে। এবার আমি ঘাবড়ে যেয়ে মাথা গরম করে ফেলি।

"স্যার। আমার লাভার। লাভার মানে স্যার আমার আমার···"

"উনি কী করেন?"

"কিছু করে না। আমার লাভার স্যার।"

"বলুন না। আমরা হলাম ডাক্তার। আমাদের কাছে লজ্জার কী আছে? আচ্ছা, ওঁর অ্যাড্রেসটা বলুন তো। আমেরিকা থেকে একজন বড় ডাক্তার আসছেন। উনি যেতে পারেন। সাহেব ডাক্তার। উনি আপনার লাভারকে দেখবেন।"

"ঠিকানাটা স্যার ভালো নয়। মানে ঠিকানা, ওখানে চিঠি ঠিক যায় না। মানে···"

"বলুন না। এলাকা দিয়ে বলুন। আমাদের গাড়ি আছে। আমরা ঠিক চলে যাব। উনি ম্যাড্রাস থেকে আসবেন। অবশ্য প্রোগ্রাম পালটালে অন্য কথা। হ্যাঁ, হ্যাঁ···'ময়ূরী' সিনেমা হল বলুন···

একটা মদের দোকান···অ্যাঁ! ও, কান্ট্রিলিকার শপ। ফাইন। বলুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে ওরা থাকে সেখানে। যেখানে আপনার লাভারও থাকেন সেপারেট ঘর। হ্যাঁ···বলুন।"

ফেরার রাস্তায় আমার মনে হয় সবটা মিথ্যে। পাশ থেকে ফোয়ারাকে দারুণ সুন্দর দেখায়।

"ফোয়ারা ব্রান্ডি খাবি? তোর কিছু হয়নি। ওরা ফালতু বলচে।"

ফোয়ারা হাসে।

"আমার কেমন নেশা নেশা লাগচে গো। এই রাস্তা দিয়ে তুমি রোজ যাও?"

"যাই। কাজ পড়লে যাই।"

"কী সুন্দর ঝলমলে দোকান। দিনমানে কত আলো!"

"একদিন গাড়ি নিয়ে সারাদিন ঘুরব। রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করব।"

"আগে সেরে উঠি। আমাকে একটা ভিমটো খাওয়াবে?"

এরপর থেকে ফোয়ারাকে সারাবার জন্যে আমি উঠে পড়ে লেগেছি। ফোয়ারার মিঠুনকে খুব ভালো লাগে। মিঠুনের একটা চকমকে বাঁধানো ছবি চাঁদনিতে এক কালোয়াড়ের দোকানে ছিল। সেটা উঠিয়ে নিয়ে এসে ফোয়ারাকে দিয়েছি। লোকটা হাঁড়িমুখো। প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল। বলল ওর ফ্রেন্ড বম্বের স্টুডিও থেকে এনে দিয়েছে। আমি বললাম পয়সা দিচ্ছি, ফিরে আনিয়ে নে। ফোয়ারার মন ভালো হবে। ছবি কী রে, তোর কলজেটা নিয়ে যেতে বললে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনব। বাড়িতেও মেজাজটা খারাপ হয়ে থাকে। বউয়ের সঙ্গে খিটিরমিটির লাগে। তবে ভয় খায় বলে আগ বাড়িয়ে হামলায় না। আমার কথা হচ্ছে কাউকে বঞ্চিত করব না কিন্তু নিজের তো একটা চাঁদনি গলি, একটা বাগান, একটা সিনেমা থাকতে হবে। সেখানে পা বাড়ালে মাথা আর বশে থাকবে না।

রাত গুটিয়ে বেড়ালভোর আড়মোড়া ভাঙছে, টিপকল ক্যাঁচর ম্যাচর করছে, ঘুম ছাড়েনি, নেশাও ছোটেনি—কে যেন নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। আলগা লুঙ্গি কোমরে জড়াতে জড়াতে বাইরে এসে দেখি আমার এক ফেউ—রিকশাওয়ালা পাঁচুগোপাল সরদার। বলল কাল পট্টিতে হাসপাতালের জিপগাড়ি এসেছিল। আজ এগারোটায় সেই সাহেব ডাক্তার আসবে। ফোয়ারা বলেছে আমি যেন যাই। ওর ভয় করছে।

শুনেই ল্যাজ গুটিয়ে গেছে আমার। এত রক্ত দেখলাম, এত ঝড়-ঝক্কি পোয়ালাম

কিন্তু কেমন মজা যে ভালোবাসার লোককে অসুখ ধরেছে বলে বিনবিন করে ঘামছি। সিগারেট ধরাচ্ছি। একবার ভাবলাম চালায় ঝোলানো হাঁড়ির পেট থেকে চেম্বারটা নিয়ে নেব। যত ফালতু ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে যাবার ফন্দি। নিজের মাথাই ভাবছে কী করে নিজেকে ভোগে দেওয়া যায়। ভয় এমন জিনিশ। ঠাণ্ডা ছুরির সামনে তলপেট যেমন থমকে থাকে ফোয়ারার অসুখের ভয়ের সামনে তেমন আমি। মাথায় চুলের গোড়ায় চুলকোচ্ছে। পাকবে। আবার রাগও হচ্ছে। মন বলছে সেই সাহেব ডাক্তার তো আজব কোনো দাওয়াই-ও আনতে পারে। আমেরিকান জাহাজীরা এসেছিল। কয়েকটা শাদা, কয়েকটা কালো। আমেরিকার ডাক্তার কী রঙের হবে? ঘরে এসে এই সাতসকালের থ্রি-এক্স এক ঢোক গলায় ঢাললাম। বেশ ধুনকি হল। নেশার একটু ভর থাকলে সওয়া যায়। আর ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলে কী কাঁটাপুকুর বন্ধ থাকবে না ক্যাওড়াতলায় ধোঁয়া উঠবে না? জয় মা গঙ্গা! ঢাল শালা আরো গলা জ্বালানো থ্রি-এক্স। আরে গুরু, আমরা হলাম হাটকাপট্টির ডাল মিল, ময়দা মিলের ছাঁট মাল। ঘাবড়ালে কেউ আর ইজ্জত করবে?

ডাক্তারদের বসার জন্যে বাইরের দোকান থেকে টুল চেয়ে আনা হয়েছিল। তিনজন ডাক্তার। তার মধ্যে সাহেব ডাক্তার কী বিরাট চেহারার। চোখে সোনালি চশমা। হাতে কালো রঙের ঘড়ি। ওরা ফোয়ারার রক্ত নিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন হাসপাতালের গাড়িতে রক্তটা রেখে আসতে ছুটল। সাহেব ডাক্তারের গলা গম গম করে। কটা চোখ।

ছোকরা ডাক্তার আমাকে বলে।

"এই যে রক্ত নিলাম এটা যাবে আমেরিকায়। বুঝলেন। সেখানে ভাইরাস কালচার হবে, টি-ফোর টি-এইট রেশিও টেস্ট হবে?"

"কিন্তু ফোয়ারার রক্ত নিলেন কেন? আর ঘরেও তো মেয়েরা রয়েছে।"

"এখানে কয়েকটা, কী বলব আপনাকে, মানে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তো। তাই। আর রক্ত গেলেই যে ওটা ধরা পড়বে এমন কোনো কথা নেই।"

"কতদিনে জানা যাবে?"

"দেখুন সেটা আমরা বলতে পারব না। ওদের দেশে একটা বিরাট মানে ঠিক হাসপাতাল নয়, জায়গা রয়েছে। সেখানে পরীক্ষা হয়। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ্। বেথেসডা বলে একটা জায়গায়। সেখানে। আচ্ছা, ওঁর মানে আপনার লাভারের হাতের ভেতর থেকে ওই দাগগুলো কতদিন দেখছেন?"

"আমার তো খেয়াল পড়েনি।"

"ঠিক আছে। খোঁজখবর দেবেন। আমরাও যোগাযোগ রাখব।"

"ডাক্তারবাবু, ভালো জিনিশ, হরলিক্স খাওয়াচ্ছি। শরীরটা এই যে ভেঙে যাচ্ছে সারবে না?"

"খাওয়ান না। আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা যা পারব করব। জানবেন গোটা দুনিয়া জুড়ে কাজ চলছে। আমরা তাহলে এবার উঠব।"

ফোয়ারার রক্ত এরোপ্লেন করে আমেরিকা যাচ্ছে। শিশিটা হঠাৎ কাত হয়ে পড়লে ফোয়ারার রক্ত পড়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে। হাসপাতালের গাড়ির জানলায় সেই ডাক্তার আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে হাসে।

"রক্তটা ভালো করে রাখবেন স্যার। শিশির গায় ওর নামটা লিখে দেবেন। অন্যের সঙ্গে না গুলিয়ে যায়। দেখবেন স্যার।"

ডাক্তার হাত নাড়ে। গাড়ি চলতে থাকে। সাহেব ডাক্তার সিগারেট ধরিয়েছে। জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে।

এতক্ষণ বন্ধ ছিল। ডাক্তাররা চলে যাওয়ার পর আমি ফোয়ারার ঘরের একটাই জানালা খুলে দিলাম। রোদ্দুর এসে ঢুকল। ঘরটায় কেমন গন্ধ। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম,

"জানো আজ সকাল থেকে মাল খাচ্চি।"

"আমার ভাবনায়?"

"ভাবনা? ভাবনা আমার নেই। আমি যখন ভাবচি না তখন তোমাকেও কিচু ভাবতে হবে না।"

"এটা কি অসুখ গো! সারে না?"

"সারবে না মানে। বড় বড় ডাক্তাররা দেখছে। ওদের অসাধ্যি কিছু আচে? তার ওপর সায়েব ডাক্তার।"

"আমার ভয় ঢুকে গেচে জানো। কত কথা বলে যাচ্ছে ওরা। সায়েবটা মাথা নাড়চে। কিচু বুঝতে পারচি না। কেমন ঘোর ঘোর লাগচে।"

ত্যারচা হয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে ফোয়ারার মাথায়। ওর মুখটা ছায়া ছায়া লাগছে।

"শরীরের অসুখ তো মনের কী? সেরে যাবে। ও নিয়ে আমি ভাবি না। জানো অত বন্দুক ছুরি ধরেচি কিন্তু মন বাঁচিয়ে।"

"তোমরা পুরুষ যে।"

"হ্যাঁ, আমি মরদ। তাই জান দিয়ে ভালোবাসতে জানি। কত বারুদ চমকাল আর এই শালার অসুখ আমাকে হারিয়ে দেবে? ভালোবাসায় শরীর আমার সবসময় রাজি, চোখ সবসময় ঝাপসা।

পাঁচুগোপালকে ডাকি। ওকে মদ আর রুটি-মাংস আনতে বলে দিই। আরো বলি খবর দিতে যে ঘরে ফিরব না। কবে ফিরব ঠিকঠিকানা নেই। রোদ্দুর মাথায় ফোয়ারা মুখ নিচু করে বসে। ওর দরজায় অন্য মেয়েরা। আমি ওদের সামনেই ফোয়ারার মুখটা তুলে ধরি।

"তুমি আমাকে এখনো চেননি ফোয়ারা। এখন থেকে এখানে আমিও থাকব।"

আমার সঙ্গে দেখা করার ঠিকানা এখন 'ময়ূরী' সিনেমার পাশে, দেশী মদের দোকানের উলটো ফুটে গলি ঢুকেছে যেখানে সেখানে অফুরন্ত ফোয়ারার ঘর। সেখানে সারাক্ষণ ও আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

১৯৮৬

শেষ রাত

ভিজে চকচকে রাস্তা, মোটরগাড়ি সারাবার গ্যারেজের মরচে পড়া টিনের চালা, তার পেছনে চটা-ওঠা থমকানো পুরোনো বাড়ি, উলটোপালটা তার দিয়ে বেঁধে খাড়া করা একটা চিমনি—এইসব আকাশচোখে দেখা যায়। আরো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পোড়-খাওয়া টিনপিঠের দোকানঘর বা বাস, মধ্যের খোপকাটা অন্ধকারগুলো মাটাডোরের খোঁদল, মাছের আধপচা পেট নয়, তোবড়ানো ট্যাক্সির খোলা। লজঝড়ে বাতিল অ্যাকসিডেন্টের গাড়িও রয়েছে যার মুখে মাটি জমছে। এবং আকাশচোখ ভিজে ঝাপটায় ঝাপসা হয়ে যাবে কারণ বৃষ্টি পড়ছে একটানা।

দুঃখী ও রাগী বৃষ্টির ফোঁটা আছড়াচ্ছে জং-ধরা টিনের চালে যার ফোঁপরা কোনাগুলো জলের মার খেয়ে দুমড়ে ভেঙে ছোট ছোট টুকরো হয়ে নীচে শানে বা কাদায় পড়ছে। সেখানে জল মরচের রক্তের সঙ্গে মিশে লালচে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। কাচের ফাঁকফোঁকর দিয়ে আলো খাবে বলে যে পোকাগুলো ঢুকেছিল সেগুলো মরে তলায় জমে রয়েছে। আলোর কাচ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। পোকাগুলোর শুকনো মড়াগুলো জলের ঠাণ্ডা পেয়ে শিরশির করছিল। বৃষ্টিটা একটানা চলছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে নয়, তোত্‌লে তোত্‌লে। রাত প্রায় একটা। বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায় ময়লা গাদায় ছাই, মবিল-মোছা পাট, ফুল, মাসিকের প্যাড, বাতিল স্প্রিং, ছোবড়া, মরা কাক, মুড়ি, ভাত, আঁশ—সব ভিজে দলা বাধছে। অনেক ফাঁকা টিন, তাসাকাঠি, কুড়কুড়ি, খুলির বাজনা শোনা যায় এরকম বৃষ্টিতে। ন্যাড়া মাথায় এর আওয়াজের হেরফের হয় না কিন্তু ঢ্যাবঢেবে পেট, চুল বা খড় পেলে শব্দটা আলাদা। জমতে থাকা জলের রংও নানারকম। কোথাও ছাইকয়লা ধাঁচের, কোথাও থুথুর মতো, কোথাও গাড়ির তেল ভাসা। এই বৃষ্টিতে নোংরা ধুয়ে যায় না। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় বদ্ধ নর্দমার ঝাঁঝরির দিকে এগোয় পোড়া বিড়ি বা গিঁট-বাঁধা নিরোধ তারপর ওখানে যেহেতু জল জমে আছে আর তলার থেকে গ্যাসের কালো বুড়বুড়ি বেরচ্ছে, তাই পালটা ধাক্কায় আবার সরে আসে রাস্তায়। এখানে সবকিছু ঘুরপাক খায় আর জমে জমে থকথকে হয়ে

থাকে।

এর মধ্যে দুটো ছেলে লড়াই করছিল। লড়তে লড়তে যখন ধক্ ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন গাড়ির বাম্পারের ওপরে বসে বা ফুটপাতে থেবড়ে ধুঁকছিল, দম নিচ্ছিল আর খিস্তি করছিল। দূর থেকে তাদের দেখলে মনে হবে ধোঁয়ার মধ্যে দুটো ঘোলাটে মানুষ ধাক্কাধাক্কি করে মরছে। আচমকা গাড়ির হেডলাইট পড়লে বাড়ির দেওয়াল জুড়ে ওদের দৈত্যের মতো ছায়া দেখা যেত।

ঘুষি মেরে মেরে মুঠোর গাঁটগুলো ছড়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ ওর দিকে তাকিয়ে হাঁফাচ্ছিল। ভিজে বাতাস টানতে মুখ দুটো ফাঁক হয়ে যায়। জিভগুলো খুঁজে খুঁজে নিজের নিজের রক্তে লালা মেশায়। যে রোগা আর পা-বেঁকা তার তলার সারির একটা দাঁত ঘুষিতে উলটে যাওয়ায় রক্ত আর ফেনা মুখে জমছিল। অন্য জনের চোখের তলায় লোহার আংটি বসে যাওয়ার গর্ত, থ্যাৎলানো মাংস। ফাটা ঠোঁট মুখের জ্বালার থেকে তাদের বাঁচাচ্ছিল দুটো জিনিশ। পেটের মধ্যে অনেকটা চোলাই মদ আর পেটের বাইরে বৃষ্টির ঠাণ্ডা জল। নেশা হয়, নেশা কাটে, টালমাটালে শরীরটা অবশ অবশ হয়ে যায়। একই সঙ্গে তারা রাগে ফুঁসছিল, থিতিয়ে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল, ঠাণ্ডায় কাঁপছিল, ফোঁপাচ্ছিল। লড়তে লড়তে এত কাছে চলে আসে তারা যে তালকানা হাতে জোরে মারা যায় না। কখনো তারা এ ওর বুকে, কাঁধে কপাল ঠেকিয়ে ঝিম মেরে থাকে। দম নেয়। আবার ধাক্কা দিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে সরে যায়। ভুল হাত চালায়। লাগেও কখনো। গলায় ঘুষি লাগলে কাশি পায়।

যার দাঁত উলটে গিয়েছিল সে ছিল কমজোরি, একটা পা ল্যাংড়া আর সরু। সে পরেছিল একটা গামছা। তার মুখটা আলুর মতো গোল, ফোলা ফোলা, হলদেটে। ওর একটা পেচ্ছাপের অসুখ আছে। চোখগুলো ধ্যাবড়া, বড় বড়। মাথায় তেলাপোকা-খাওয়া টাক, কোথাও কখনো খামচা খামচা খোঁচা কটা চুল। দু-নম্বর তার চেয়ে অনেক লম্বাচওড়া, কলার দেওয়া নাইলনের গেঞ্জি পরা (বুকে লেখা NO EXIT), তলায় মরাসাহেবের প্যান্ট। খোলতাই কালো চেহারা। গামছা-পরার নাম ল্যাংড়া আর যার সঙ্গে তার লড়াই চলেছে, ঘামাসান ফাইট চলেছে তার নাম গরিব যদিও মোটর-মহল্লাতে তার নাম গরিবুয়া। বিস্কুট কারখানা ছিল ওই যে ভাঙা বাড়িটা, যেখানে চোলাই বিক্রি হয় এবং পুলিশ থেকে মালিশওয়ালা, মগা, চেম্বারচালানি সবাই যাকে পাঁইটমহল বলে সেখানে সে রোজকার ঠেকদার। ল্যাংড়া ল্যাংড়াই, জন্মদোষ—পেট থেকে টেংরি বার করা থেকে মায়ের লাল, বাপমরা। ঠিক হিশেবে মানুষ নয়। অন্যদিকে গরিব ইমানদার, ভালো পয়সা কামাই করে, ছেদিলালের গ্যারেজে বডির কাজ করে, রঙের কাজও জানে। ছেলেটার গোঁ আছে। তাই রংবাজি না করলেও মস্তানরা ওর কাছে মদ-বিড়ির পয়সা চায় না। পেট ভরে চোলাই না গিললে গরিব আজ ল্যাংড়াকে মেরে ফেলত। কিন্তু এমনই যাদু যে একটা থান্‌কা ইট ধরে তুলতে পারছে না। হড়হড়ে শ্যাওলা-ধরা ইট ফস্কে নীচে পড়ছে। আর পায়ের দোষ আছে বলে ল্যাংড়া কখনো এক জায়গায় দাঁড়ায় না। টুকটাক হড়কে যায়। ফলে ঘুষির বা লাথির আন্দাজ ঠিক থাকে না। গরিব ফস্কে ইলেকট্রিকের বাক্সে লাথি মেরে পা চেপে বসেছিল। ল্যাংড়া তখন তার ঘাড়ে বুকে মুখে লাথি চালাচ্ছিল।

এইভাবে যারা লড়ছে তারা কিন্তু বন্ধু। দোস্ত তো বটেই, আরো কিছু। এদের বয়স উনিশ-বিশ হবে। ল্যাংড়া গরিবের পয়সায় ভাতরুটি খায়। ল্যাংড়ার মা মোতিও খায়।

পেটভাত যখন আছে তখন নিশ্চয় ভাতপেটমনের একটা ব্যাপার, একটা ক্যাচালও আছে। গরিব ল্যাংড়া আর ল্যাংড়ার মা মোতির ঘরে থাকে। মোতির সঙ্গে শোয়। গরিব মোতির লাভার। পেটফেট না হয়ে যায় সে জন্যে গরিব মোতিকে হাসপাতাল থেকে বানিয়ে নিয়েছে। কেসটা সবাই জানলেও গরিবের বাপ ভেবেছিল বিয়ে দিলে বোকা ছেলেটা আধবুড়িটার গতর থেকে সরে আসবে। বউ, মা, বাপ—সব থাকতেও তা হয়নি। গরিব ল্যাংড়াদের ঘরেই থাকে। ওখানেই পয়সা ঢালে। ল্যাংড়া হল আসল মায়ের লাল, মাইপোষা। বুদ্ধিও পুরো গজায়নি। ড্যাবডেবে চোখ খুলেমেলে ও এসব মেনে নিয়েছে। শুধু পেটে মাল পড়লে ওর মাথা গরমে যায়। তখন হয় কেঁদেকেটে নয় মারামারি লাগাবে, বাওয়াল করবে। এরকম হামেশাই হয়। ল্যাংড়া মরে গেলে গরিবের ভালো। কিন্তু মারবার ইচ্ছেটা যখন হয় তখন পেটে মালের গ্যাঁজগ্যাঁজানি এমন থাকে যে কাজটা সারা যায় না।

ল্যাংড়া জিভ দিয়ে উলটানো দাঁতটা সোজা করে ফেলে, সেটা কিন্তু না দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঢলে পড়ে। মুখের রক্তটাকে ও থু থু করে ছেটায়। মাথা ঝাঁকায়। গরিব আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে বৃষ্টি লাগাচ্ছিল। তখন ল্যাংড়া ওকে গলার ওপর মারে। গরিব ট্যাক্সির কেরিয়ারের ওপরে ছেতরে পড়ে যায়। ল্যাংড়া জিতছে।

—আজ তেরা খুন পিয়েগা ম্যায়। সব চুদুড়বুদুড়, সব ঢুপঢাপ আজ খতম করে দিব।

—দেখ ল্যাংড়া। বহোত জোর মারা তু। এবার গলায় পা তুলে চেপে দিব মরে যাবি।

—তু কি মারবি বে! শালা, আমি দুবলা বলে তুই আমার মা-র সঙ্গে শুবি, বেইজ্জত করবি আর আমি মেনে লিব! হারামি কা বাচ্চা!

—হাট শালা। কুত্তাকা আওলাদ। হারামখোর। কোন তেরা মা কো বেইজ্জতি করিসে। জান লড়িয়ে দিইনি! খাওয়াই না!

—আরো খাবো। তোর জান খেয়ে লিব। সালফুর এসিড ঢেলে দিব মুখে। লিজের মাগীর কাছে যা না। খানকির বাচ্চা। মেরা মা কো ছোড় দে ইয়ার। তোর বউ-টা ডবকা আচে। সাঁটিস মাল। যা না।

দিনের বেলায় ল্যাংড়া যখন চুকচুক করে গ্যারেজের বাইরে ঘুরে বেড়ায়, ফুটপাথে বসে কাওয়ালি ধরে "পর্দা মে রহনে দো, পর্দা না হাটাও" তখন কাজের ফাঁকে বেরিয়ে এসে গরিব ডবল রুটি, চা আনায়। দুজনে খায়। খাওয়ার পর ল্যাংড়া চলে যায়। যাবার সময় কয়েকটা বিড়ি নিতে ভোলে না। গরিব ওকে সিনেমা দেখতেও পয়সা দেয়। ল্যাংড়াকে বস্তির ছেলেরা "মায়ের দ্যাওর" বলে ক্ষ্যাপায়। তখন ও খিস্তি করে, বার করে দেখায়, কাঁদে, ইট ছোঁড়ে, আবার রাগ ভুলে আপনমন হয়ে যায়। পানের দোকানের পাশে ব্যাটারির বাক্সে বসে রেডিও শোনে।

জাপটা-জাপটি করে পড়ে যায় দুজন। গলার নলি টিপে শেষ করে দিতে চেষ্টা করে। শরীরের সব বিষ আঙুলে চলে আসে। পারে না। গলায় নখ বসায়, খামচায়, বড়জোর আলতো চাপ দেয় আর ভাবে অন্যজনের দম ফুরিয়ে আসছে। আর একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখতে পারলে ঠাণ্ডা মেরে যাবে। খেঁকিয়ে-ওঠা একটা চিৎকার শুনে দুজনেই সরে যায়। টলতে টলতে ওঠে। দিনকয়েক আগে লোডশেডিঙে ট্যাক্সির ধাক্কায় একটি কুকুরের কোমর ভেঙেছে। বাতিল ময়লার গাড়ির তলায় সেটা মরছে। তবে জানের জোর ছিল বলে মরতে সময় নিচ্ছে। আস্তে আস্তে। ঝিম মেরে পড়ে আছে, আছে, হঠাৎ কখনো ভাঙা হাড়ে ব্যথাটা লাগে আর তখন চিৎকার করে ককিয়ে ওঠে। দিনের বেলায়

গায় পিঁপড়ে উঠছে। মাছি বসছে। চিৎকারটা গোড়ায় ঘড়ঘড়ে থাকে, শেষে ছুঁচোলো হয়ে সরু হয়ে মিলিয়ে যায়।

ওরা দুজনে উঠে টলতে টলতে ময়লার গাড়িটার কাছে যায়। কুকুরটা উঠতে পারে না। শুধু মাথাটা একটু তোলে। ঘোর-লাগা, পিচুটি-পড়া চোখ। ভিজে লেজটা নাড়তে চেষ্টা করে। জল তার পড়ে থাকা শরীরটা ঘিরে বয়ে যায়।

—আবে এ জঙ্গু! জঙ্গু!

কুকুরটা তাকিয়ে থাকে। কান একটু নড়ে।

—খুব দর্‌দ্‌ লাগছে। দুধরুটি খাবি?

ল্যাংড়া যে ট্যাক্সিটা ধাক্কা মেরেছিল তার ওপরে রেগে যায়। রক্ত চুষতে চুষতে চেঁচায়।

—আওর এক দিন চুতিয়া আবেগা ইধার উধার সিসা উসা সব তোড় দেগা। ইনসান হোক, জানোয়ার হোক উসকা ভি তোর মত জান আচে। ভগবান বিনা কোই কিসিকো জান নেবে না। বোল্‌!

গরিব ওকে বোঝায়।

—নেশার ধুনকিতে ঝেড়ে দিয়েচে। জেনে বুঝে মেরেচে যে তুই চিল্লাচ্চিস?

—ছোড় বুড়ুয়া। শালা দুখানা লাইট দিয়েচে কি মারাবার জন্যে! গাড়ি চালাচ্চে। একরোজ মিল যায় না স্টিরিং ওর গাঁড়ে ঘুষিয়ে দিব।

—জঙ্গু বেটা! দেখ না, ছুটকি তুঝকো বুলাতি হ্যায়। এ জঙ্গু! জঙ্গু!

জঙ্গু মাথা তোলে না। তাকিয়ে থাকে। বৃষ্টিটা বাড়ছে। ওরা কিছুক্ষণ চুপ করে টলছিল। চটকা কাটিয়ে ওঠে।

—শালা মর রহা হ্যায়।

—মর রহা হ্যায় তো জলদি জলদি ভোগে যাও। ঘাঁউ ঘাঁউ লাগিয়ে রেখেছে। কাল যদি শালা না মরো তবে তোমাকে বস্তায় বেঁধে বাসরাস্তায় পেতে দিয়ে আসব।

—হাঁ, এক টেক্সি কেলিয়ে দিয়েচে, ভারী বাস, লরি ভগবানের কাছে দিয়ে দিবে। বেঁচে যাবি।

—জঙ্গু মরে যা। আজ বারিস কা রাত। আচ্ছা মওকা। বহোত ধুমধাম। গঙ্গাপানি শির রহা হ্যায়। মরে যা। ভগবান পুষে লিবে।

—হাঁ জঙ্গু, মরে যা না বে!

কুকুরটা চোখ বুজে রাখে। কোমর ভেঙে চেপটে পিষে গেছে বলে পাঁজরগুলো বেশি ফুলে উঠে ধুকপুক করছে। বৃষ্টিটা আরো বাড়ছে। ঝুঁকে পড়ে দুজনে দেখে। ওরা ভাবে কুকুরটা মরে গেছে।

—জঙ্গু! এ জঙ্গু! মরে গেচিস?

—জঙ্গু বাবা! হাঁ বে! শালা মরে গেল।

—মরে গেল?

—মরে গেল।

—আমরা বললাম মরে যেতে, শালা মরে গেল! তব তো যাকে বলব মরে যেতে সে মরে যাবে। লে, মরে যা!

—তুই ভি মরে যা।

—এ আমরা মরে গেচি। দেখ। ঠাণ্ডা লাশ। মরে গেচি।

—তো বুলালে দো মুর্দা পাঁইট!

দুজনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে আর জল ছপকে লাফায়। নাচতে শুরু করে।

—জঙ্গু বোলা হোরিবোল!

—জঙ্গু বোলা হোরিবোল!

—বলো হোরি হোরিবোল!

—বলো হোরি হোরিবোল!

—দুনিয়াদারি হোরিবোল!

—দুনিয়াদারি হোরিবোল!

—মায়ের ভোগে হোরিবোল!

—মায়ের ভোগে হোরিবোল!

ওরা রাস্তায় ছপছপে জমা জলের মধ্যে নাচতে থাকে। এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার ধারের আলোগুলো দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। ওরা নাচতে থাকে আর ওদের পায়ের ঠোক্করে জলে আলো ঠকরায়। হিলহিল করে। একটা মস্তি ভর করেছে ওদের ওপর। নাচাচ্ছে।

রাস্তাটার দুপাশ থেকে বস্তি চিরে দুটো ত্যারচা কাঁচাগলি মুখোমুখি পড়েছে। বাঁদিকে একটা টিনের চালার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল গরিবের বউ মালতী। গরিব কখনো ওর কাছে যায়নি। মেয়েটা কালোর ওপর চমৎকার দেখতে। চোখে কাজল দেয়। শাদা টিপ লাগায়। সাজে। সবসময় ঘোমটা রাখে। গরিব ওর সঙ্গে একটা আস্ত রাতও কাটায়নি। একটাও ভালো কথা বলেনি।

মুখোমুখি পড়ে গেলে গরিব দাঁত চেপে নিচুগলায় হিসহিস করে।

—তোর বাপের ঘরে চলে যা, ফের শাদি করে নে।

—মা ঘর যেতে বলেচে।

—যে যা বোলিসে বোলনে দে। আমি আসব না। যা বলচি শোন—গাড়িভাড়া লিয়ে লে। কাপড়া-উপড়া লেকে বাপের ঘরে চলে যা।

—আমি একদিন বিষ খেয়ে লিব বললাম। সব লোক জানবে। পুলিশে বলব।

—খাবি তো খা। আর লোক জানবে। হামরা কেয়া? পুলিশ। ফোটা!

—বেশরম! আমি তোর বউ না?

—কেন বে? আমি বলেছিলাম আমাকে শাদি করতে? হামারা বাপ বিয়ে দিয়েছিল, তোকে এনেছিল··· ওই শুডঢাকে বল তোকে নিয়ে থাকতে, ভালো মাল আছিস।

—জানোয়ার!

মালতী দেখছিল ওরা রাস্তায় জমা জলের মধ্যে লাফ দিয়ে দিয়ে নাচছে। ল্যাংড়া জল ছেটকায় বেশি। বৃষ্টির ছাঁট আসছে। জলের জোর বাড়ছে।

—ডিস্কো বোলা হরিবোল!

—ডিস্কো বোলা হরিবোল!

রাস্তার আলোয় দেখা যায় জলের ওপর পেট্রল, মবিল ভাসছে। জল মালতীর পায়ের গোছায় উঠে আসে। সায়ার তলায় লেগে সপ্‌সপ্‌ করে। উলটো গলি দিয়ে মোতি আসছে। মালতী ফিরে ঘরের দিকে যায়। বৃষ্টির মধ্যে গরিব আর ল্যাংড়ার হাসি শোনা যায়।

—আবে এ ল্যাংড়া!

—কা বে!

—তু হামকো বহোত পিটা বে। শালা, ইতনা মারা তু ম্যায়···

—আমি তো তোর জান লিব বে। যিস দিন, যিস রাত মওকা মিলেগা তোকে লাশ করে দিব। শিক ঢুকিয়ে দিব চোখে।

—আজ ঠাণ্ডা মেরে গেচি। শালা জলে ভিজে ভিজে কুছু তাগত্ নেই। নেহি তো আজ তেরা আখরি রাত হয়ে যেত।

জলের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে দুজনে ইট খোঁজে। পায় না।

উলটোদিকের গলির মুখে ভিজে ভিজে মোতি এসে দাঁড়ায়। তার বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। আলগা নরম চেহারা। বেঁটেখাটো। ভারী বুক। কাপড় ভিজে লেপটে পেটের দিকে নেমে এসেছে। মোতির পায়ের, কোমরের, পিঠের, ঘাড়ের আলগা একটা ভাব গরিবকে খুব মাতায়।

ল্যাংড়া দূর থেকে মোতিকে দেখতে পায়।

—মা!

মোতি এক পা এগিয়ে আসে।

ল্যাংড়া জলের মধ্যে আছাড় খেতে খেতে দৌড়োয়। সে এখন মা-র কাছে যাচ্ছে। জল ভেঙে ভেঙে। লেংড়ে লেংড়ে। গামছাটা খুলে জলে পড়ে যায়। সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ল্যাংড়া ন্যাংটো হয়ে দৌড়ে দৌড়ে মোতির কাছে যায়। সামনে গিয়ে পড়ে যায়। আবার ওঠে। মোতি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ল্যাংড়া মা-র বুকে মুখ ঘষে, কামড়ায়, কাঁদে।

—মা!

মোতি ছেলেকে চুমু খায়। গোল বেঢপ মাথায়।

—মা! ও হামকো বহোত মারিসে। দেখনা, মেরা মু মে খুন!

মোতি ছেলেকে বোঝায়।

—আমি ওকে খুব বলে দিব। চলো বেটা। ঘরে চল্। রাত কত হয়ে গেল বাবা।

ল্যাংড়া কাঁদে আর মাকে জড়িয়ে গলির পেছল রাস্তায় আনাড়ি পা ফেলে ফেলে এগোয়। ওর মুখের রক্ত মোতির বুকের ওপরে লাগে আবার বৃষ্টিতে ধুয়েও যায়।

—মা, দেখে লিবি আমি তোর বেইজ্জত হবে দেব না। তু মুঝকো দুধ পিলা দে মা। আমি ওর লাশ ফেলে দিব।

মোতি ছেলের মুখে চুমু খায়। আদর করে।

—ইতনা শরাব পিয়া বাবা। ঘর চলো মেরি লাল। চল্।

—ওকে তুই ঘরে ঢুকতে দিবি না। দেখনা হামকো কিতনা মারা।

—না ঢুকতে দিব না। চল্··· ধর্, জড়া আমায়।

মোতির গায়ে জোর আছে। সে ছেলেকে জাপটে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়। গলির ভেতর জল দাঁড়ায় না। কাদা আছে।

গরিব দেখে ওরা গলি দিয়ে ভেতরে বস্তির দিকে চলে গেল। সেও জল ভেঙে ভেঙে ওই দিকে এগোয়। টলে গিয়ে পড়ে যাওয়ার মতো হলে দাঁড়িয়ে পড়ে টাল সামলায়। জলের তলায় ওর ডুবে থাকা পা হালকা আর সারা শরীরে বৃষ্টির ভার। মালতী যেদিকে ফিরে গেছে সেদিকে এক লহমাও সে তাকায় না।

বৃষ্টি আরো জোরে পড়ছে। অন্ধ জল। ঠাণ্ডা হাওয়া, উল্লসিত আলো, অন্ধকার। জলের বুকপিঠ চকচক করছে। নির্লোম। জঙ্গু এখনো মরেনি। অনেকটা মরে এসেছে।

ভিজে লোম, চামড়া, থাবা, ভাঙা হাড়ের ওপরে ঠাণ্ডা জল লেগে আরাম লাগছে। ঝিম ধরছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বললেও বৃষ্টির শব্দের মধ্যে থিতিয়ে ফুরিয়ে আসছে রাত। টিনের চালে চড়বড় করছে পাগলা বৃষ্টি। সব নোংরা, জঞ্জাল থইথই করছে জলের মাথায়। পাক খাচ্ছে। নর্দমার জমাট ঝাঁঝরি থেকে উথলে উঠছে পাঁক গোলা জল। আকাশচোখে কোনো মানুষ দেখা যায় না।

এত জল নীচে ও ওপরে, এত জল নিয়ে ভিজে ভারী ফুলে ওঠা রাত কোনো একটা বেওয়ারিশ তারিখবিহীন ঘোলাটে সকালের দিকে চলেছে। এ বৃষ্টি থামবে? কাল হয়তো কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটবে না। বৃষ্টি গজরাচ্ছে। আবার কাল তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও শুরু হতে পারে।

১৯৮৬

কাল্‌মন ও মোগলাই

কাল্‌মন আর আমি মোগলাই, চুরি করতাম। আমরা কলোনিতে থাকি। আমাদের জন্মের সাল আমরা জানি না তবে আমার দাদা আর কাল্‌মনের কাকা যখন পুলিশের গুলিতে, পার্টির লোকের হাতে একই রাতে মারা পড়ে তখন আমরা দেড়-দুবছরের বাচ্চা। মাথাভরতি উকুন। কাল্‌মনের হাড়গিলের মতো চেহারা—মুখটা লম্বাটে। কানঢাকা ঝোপচুল। পুরোনো বোমার মশলা নিয়ে আগুন ভসকাতে গিয়ে আমার মুখের একদিক পুড়ে যায়। সেই থেকে আমার নাম মোগলাই। কেউ কেউ পরোটা বলেও আমাকে ডাকে। আমার পোড়া কানটা কুঁকড়োনো ছোট। এক চোখের ভুরু নেই। অন্যদের কথা শুনে আমার মা-ও লিজ-দলিল নেয়নি। আমাদের কলোনিতে সিপিএম বেশি। কংগ্রেসও আছে। আমাদের বাড়িতে লাইট নেই। বাড়িতে লোকজন এলে আমরা ল্যাম্পপোস্টে তার লাগিয়ে কারেন্ট টেনে আনি।

আমি ক্লাস সিক্সে উঠেছিলাম। তারপর বাবার কারখানা লক্ আউট হয়ে গেল। পড়া ছেড়ে দিলাম। মনে আছে বাবা একটা ছাপ-মারা কৌটো নিয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত। কলোনির হরিপদ কাকাও থাকত। বাবার হাঁপানি ছিল। খুব বিড়ি খেত। একদিন রাতে ভাত খাবার সময় খুব কাশি হয়। মুখ দিয়ে রক্ত বেরোল। মরে গেল। খুব বৃষ্টি পড়ছিল তখন। আমি ভিজে ভিজে এ-বাড়ি ও-বাড়ি খবর দিয়েছিলাম। আমার মা খুব রোগা। কোমরে ব্যথা আছে। তিন-চার মাস পর পর আমি গড়িয়ায় যাই বায়োকেমিক ওষুধ আনতে। ওরা বিনা পয়সায় দেয়। রেশন তুলতে হয়। কেরাসিন কিনতে হয়। আমি চুরি করি। মা ঠোঙা বানায়। তারপর নিজেই গিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে আসে। মা হয়তো জানে আমি চুরি করি। কাল্‌মনের ছোটবেলা থেকেই বদনাম। কাল্‌মন আমাকে যখন রাতে ডাকতে আসে তখন মা বুঝতে পারে বোধহয়।কিন্তু কিছু বলে না। কাল্‌মনের বাবা আছে, মা আছে। ওর দিদি আশা গত বছর এক টেম্পো ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। শোনা যায় হাওড়ায় নাকি থাকে। আমার মা আর বেশিদিন বাঁচবে না। চালসে ধরে যাচ্ছে। লোকে বলে মা-র শরীরে রক্ত নেই। খেলে তো রক্ত হবে। রক্ত হচ্ছে!

গত বছর আমরা গ্যারেজের মবিল পেট্রলের জেরিক্যান ও দুটো খোলা হেডলাইট যখন প্রথম চুরি করি তখন আমাদের ভয় ছিল। এখন লোক ঘুমোলে আমাদের সাহস বাড়ে। সেই চোরাই মাল বেচে অনেকদিন আমরা চিনিবিস্কুট; সিগারেট, চা খেয়েছিলাম। সিনেমা দেখেছিলাম। তারপর আমরা ঘড়ি চুরি করেছি জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে। একটা রেডিও জানলা অব্দি এনেছিলাম। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে গলেনি। গোলমাঠ ছাড়িয়ে যে নিচু রাস্তা সোজা ফুঁড়ে নেহরু নগরের দিকে গেছে সেখানে একটা বাড়িতে কাঁটাতার ঘেরা বাগানে রাখা বাচ্চার রং-করা জিপগাড়ি চুরি করে ফেরার সময় আমাদের সঙ্গে ফকিরের আলাপ হয়। ফকির দোখ্‌নো মাল। আমাদের মতো বাঙাল নয়। ফকির দিনে স্টেশনে মোটমাল টানে, মাল খালাশের কুলির বদলি হয়, কয়লা বা স্টোনচিপস্ নামায়। রাতে চুরি করে। স্টেশনে ঘুমোয়। ফকিরই আমাদের বুদ্ধি দেয়—

"এই টিনের গাড়ি চুরি করলে দিন চলবে? খাব না খাব না ইচ্ছে, একপালি চাল, একটা উচ্ছে। নাইনে য্যাখন নেমেইচিস ত্যাখন ভালো পয়সা করতে চাস তো ছেনতাই কর। মেলা টাকা পাবি। দুজনা আচিস।"

ছেনতাই যদি ভালো হয় তাহলে তুই করিস না কেন? ফকির বলে ওর সাহস নেই। ছেনতাই করতে ছুরি লাগে, বন্দুক লাগে।

"পোঙা ঢাকার কাপড় নেই, বন্দুক ছুরি পাব কোথায়? হ্যাঁ, এই কারবার চলে টেরেনে—শালা তিন-চারজন করে ঝপাঝপ উঠবে—গর্দানে ভোজালি ঠেইকে বার কর শালা কী আছে ট্যাকে। ব্যাস্ খামচা মেরে সব কেড়েকুড়ে নে টেরেন ঢিলে দিলেই দুদ্দাড়ে নাফ দে পালাও। তারপর আর কী? বসে বসে খাও!"

ফকির আমাদের চোলাই আর চিতি কাঁকড়ার চচ্চড়ি খাইয়েছিল। আমরা বসেছিলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কোণে। ওখানে ঢাল শুরু হয়েছে মাটির দিকে। খালি পেটে ঝালে মালে জব্বর নেশা ধরেছিল। দুনিয়ার এই হল নিয়ম। ভগবানের বানানো। একজন পড়িয়ে যাবে আর মুরগিরা ফেঁসে যাবে। এইভাবেই আমাদের লাইন ঠিক্ হয়। তারপর রেলগাড়ি চলতে শুরু করবে। দাদাকে ফাঁসিয়েছিল পার্টি। বাবাকে ফাঁসিয়েছিল লক্-আউট, হাঁপানি। আমাদের ফাঁসিয়েছে ফকির। এত নেশা যে ঠোঁটে বিড়িটা অব্দি কাল্‌মন ধরে রাখতে পারে না। ট্রেনগুলো মনে হয় নেশার ঘোরে বেসামাল হয়ে বুকের ওপর উঠে আসবে। আমার সঙ্গে একটা মেয়ের ধাক্কা লাগে ওভারব্রিজের ওপরে। মেয়েটা খিস্তি করে। কাল্‌মন আর আমি ওভারব্রিজের ওপরে লোহার বারান্দায় দাঁড়াই। পায়ের তলা দিয়ে ট্রেন চলেছে। ফাঁসাও, যত চাও ফাঁসাও। মুরগি রেডি।

বসে বসে খেতে চাইলে নতুন ধান্দা খুঁজতে হবে। ছিচঁকেমিতে চলবে না। 'কাল্‌মন একটা টিপনি ছুরি জোগাড় করেছিল। আমার জন্যে এনেছিল কলের জোড়ের একটা বেঁকা পাইপ। ওইটা দেখলে লোকে ভাববে পিস্তল। যুক্তি হল যে কোয়ার্টারে ছেনতাই করতে যাওয়া হবে। কোয়ার্টারের মাঠে অনেক বাড়ি। বাড়ি বাড়ি টাকা আর গয়না। জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা। চারদিকে মাঠ। আলো কম। রাস্তার আলো তো জ্বলেই না। মঙ্গলবার আমরা কোয়ার্টারে যাব। রাত দশটার থেকে নাইট-গার্ড আসে। হুইসল মারে। ল্যাম্পপোস্টে লাঠি মারে। ঠং শব্দ হয়। তার আগেই। কোয়ার্টারের ঘরে ঘরে বড়লোক। ছিলিমের দমের মতো ভয় আমাকেই প্রথম ধরেছিল—

—'এই দ্যাখ্। যদি ধরে কিন্তু এক্কেরে মাইরা ফ্যালাইব।"

"ব্যাঙ! জায়গা তো জান না। চাইর ধারে মাঠ। ধাওয়া করা সহজ নয়।"

কাল্‌মন কী যেন ভাবছিল আর হাতের নখ দিয়ে পায়ের নখ ছিঁড়তে চেষ্টা করছিল। আমার খটকা ছিল দরকারে ও ছুরি টানতে পারবে কিনা—

—"তুই চাক্কু চালাবার পারবি?"

"না পারার কী আছে? গত কালীপূজায় মনে নাই পোদ্দার পার্কের লগে গোলমাঠে খিট হইল, সমুদা কেমন দুইটা ছেলেরে জখম করল?"

"সমুদা করল করল। তুই পারবি?"

দেইখা নিবি। ছেনতাই-এর চাক্কু সাবধানে চালাইতে হয়—ঠেকাইলেই তো সব চুদুরবদুর খতম। প্যাটফ্যাট ফাইড়া গেলে কি গলায় লাগলে তো মইরাই যাইব।"

"গয়না তুই বেচবি কোথায়। গ্যালেই তো চিনব।"

"তুই একটা মইষ। পাড়ায় কে যায়! বড়বাজার চিনি না? কইলকাতায়।"

যদি মার্ডার হয়ে যায়। কথাটা আমরা তলিয়ে দেখিনি, কাল্‌মন ভেবেও বলেনি। এতক্ষণ আমরা অন্য কথা ভাবছিলাম। দু-হাজার টাকা ভরি। একটা হার যদি জুটে যায়। কিন্তু মার্ডার। বাঁচকে রহনা রে বাবা, বাঁচকে রহনা হ্যায়···থানাতে এখনো ডাক পড়েনি আমাদের। তবে কনস্টেবলগুলো বোধহয় চিনে ফেলেছে। এরপর একদিন থানাবাবুর চিঠি নিয়ে সাইকেল যাবে কলোনি কমিটির কাছে। কলোনি কমিটি ওয়ার্ড কমিটিকে জানাবে। বাড়িতে কাকুরা আসবে। ছেনতাই করো আর ডাকাতিই করো বাঁচকে রহনা রে বাবা তুঝপে নজর হ্যায়।

"একটা ভারী ওজনের হার যদি পাই তাহলে কী করব বল দেখি?"

—"চপ, কাটলেট, চাইনিজ খাব। বিয়ার টানব।"

"ওইদিন জানিস তো ফুটনের বোনটারে মটনরোল খাওয়াইয়া খুব টিপছি।"

—"দিল?"

—"দিল। হাড়ডিগডিগা।"

"তর ওই পোড়ামুখ দেইখাও মাল আসে? হালা আমারই তো ভয় লাগে। যা একখান খোমা বানাইছস। আমার মাইরি একটা মাল জোটে না যে উড়ামু। এই তো পারুলরে সেদিন সিনেমায় যাইতে বললাম। গেল না।"

—"তর কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ চাইপা ধরবি। কেন দিবে? অগো কি মন নাই?"

—"দাড়া, কোয়াটারে যদি একটা গয়না পাই তারপর পারুলরে দেখুম কেমন না দেয়।"

ফি মঙ্গলবারই লোডশেডিং বিকেলে রুটিনমাফিক শুরু হয়ে যায়। ক্লাবের ঘরে টিভি দেখা যায় না। কুপকুপ করে অন্ধকার। মধ্যে তিনটে দিন। ওই তিনদিন আমরা আর চুরি করতে বেরোইনি। কাল্‌মন ছুরিতে তেল দিল। স্প্রিং-এ তেল পড়ায় ফলা লাফ দিয়ে বেরোয়। কাল্‌মন ফলাটা প্যান্টে মুছে নেয়। চকচক করে। আমিও আচমকা পকেট থেকে কলজোড়ার নল বের করে চমকাই। এক এক করে আমাদের চোখের সামনে রাতের সব আলো নিভে যায়। নানা গয়না, হার, বালা, চুড়ি, দুল ঝলমল করতে থাকে। এভাবেই একসময় মঙ্গলবার এসে পড়ে।

কোয়ার্টারে পৌঁছতে হলে মাঠ ভাঙতে হবে। আমরা আমাদের কলোনির দিকের মাঠ এড়িয়ে উলটোমুখের রংকলের মাঠ উজিয়ে আসি। আমাদের দুজনের গায়ে নাইলন গেঞ্জির ওপরে র‍্যাপার জড়ানো, পায়ে ছেঁড়া কেডস। অন্ধকারে কুয়াশায় ভেজা ঘাস, একটু বড় শেয়ালকাঁটা গাছ, বাবলার চারা পায়ে সপাট-সপাট করে লাগে। আকাশে

মেঘলা কারণ একটা এরোপ্লেন গেল যার আলো দেখা গেল না। ভ্যাপসা শীত।

—"মোগলাই।"

"ক।"

—"তুই নল দূরে ধরবি।"

—"ধরব।"

—"আমি চাক্কু এদিক-ওদিক ঘুরামু।"

—"ক্যান?"

—"চকচক করব। হালারা মুইত্যা দিব।"

—"আন্ধারে কিছু ঠাহর হয় না। চাক্কু চমকাইব ক্যামনে?"

—"চাক্কুর ধক আছে।"

ছুরিটার বাঁট মোষের শিঙের। তাতে তামাটে পেরেক মারা। পাকা রাস্তা শুরু হয়। অন্ধকার। কয়েকটা জায়গায় দূরে ব্যাটারির আলো জ্বলছে। মোমবাতির হলদেটে আলো।

—"দেখছস। বেটারির লাইট। ঘরে ঘরে টিউব। হালাগো কত পয়সা জানস?"

—"চুরির পয়সা। গরিবের পোঙা মাইরা বাড়িগাড়ি বানাইছে।"

—"খায় কী! ফল, আঙুর, গরু, মোরগা, টিনের মাখন—লাশগুলা কী মোটা!"

—"মাইয়াগুলাও সলিড।"

—"ভাবলেই তাইত্যা যায়।"

—"অত হিট ভালো নয়।"

আমরা কোয়ার্টারের প্রথম গলিতে ঢুকে পড়ি। তিন-চারটে বাড়ি পেরোতে না পেরোতে একটু তফাতে সিগারেটের আগুন দেখা যায়। লোকের গলা, ফিন-ফিনে মেয়েমানুষের গলা পাওয়া যায়। আসছে। আমাদের শিরা টানটান হয়। তলপেটে কিছু একটা হয়। মুখে ভয় জমে। গিলে ফেলি।

সবচেয়ে যখন দরকার চুপচাপ থাকার তখনই খোঁদলে গাড়ি ধোয়ার জল না কিসের মধ্যে কাল্‌মন খপাৎ করে পা ফেলে। কাদাজল ছিটকোয়।

টর্চ ঝলসে ওঠে। কাল্‌মনের হাতে ছুরি নেই। আমারও কলের নল পকেটে ঠাণ্ডা হচ্ছে। কোথাও ট্রানজিস্টার রেডিও চলছে। ইংরিজি খবর বলছে।

লোকটার ছাঁটা গোঁফ ছিল। মিলিটারি বা পুলিশের লোক হবে। পেল্লায় চেহারা। গায়ে চিকনের পাঞ্জাবি, পায়জামা, শালজড়ানো। হাতে দামি ঘড়ি চকচক করছে। সঙ্গে প্যান্ট, জ্যাকেট পরা তিনটে মেয়ে। লোকটা বাঘের মতো চোখ করে আমাদের দুজনকে দেখে। আমরা নড়ি না। আমি কাল্‌মনকে বলি—

—"গয়না নাই। তুই কস তো নল বার করি।"

—"চুপ কইরা থাক্। নড়বি না।"

একটা মেয়ে, চওড়া পাছা, লোকটাকে বলে—

—"ড্যাড, আর দে ক্রিমিনালস্?

লোকটা ঘোঁত্, ঘোঁত্ করে। আধবুড়ি একটা মেয়েলোক বলে ওঠে—

"স্ক্রু দেম হানি। লেটস্ মুভ অন।"

ওরা চলে যায়। একটা মেয়ে বলে ওঠে, ইয়ে তো কামাল হো গয়া। মেয়েগুলো হেসে কুটিপাটি হয়। লোকটা দু-একবার পেছনে টর্চ মারে।

—"বাপরে, তাকাইয়া থাকে য্যান গণ্ডার!"

—"হালার সাহেব, আমরাও ভদ্রলোকের বাচ্চা। বল্?"

দু-তিনটে বারান্দায় আলো জ্বলে টর্চের। গলা শোনা যায়। আমরা এগোই। এ-গলি ও-গলি দিয়ে বাঁক মারি।এলোপাথাড়ি চলতে চলতে দুজনের মধ্যে ধাক্কা লেগে যায়। দূরের আকাশে আগুনের মতো আলো। ওদিকে কারেন্ট আছে।

—"হালায় তর গয়নাপরা মাগীরা আর বাইরাইব?"

—"তর বউ বাইরাইব। শুয়ারের বাচ্চা। চুপ মাইরা চল্।"

দেওয়ালে বিরাট বিরাট ছায়ার নাচানাচি দেখে আমরা থমকে যাই। নানারকম মুখের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছিল। অনেকগুলো মোমবাতি জ্বেলে দরজা জানলা সব হাট করে খুলে দুটো ছেলে দুর্দান্ত ক্যারাটে লড়ছে। হাত দুটোতে দুজনেরই মাসলের ঢেউ খেলছে। সরু কোমর। চওড়া বুক। খালি গায়ে। জিন্স পরা। আমরা ব্রুস লি'র সিনেমা 'এন্টার দা ড্র্যাগন' দেখেছি কিন্তু কখনো সামনে এরকম তাজ্জব লড়াই দেখিনি। ছেলেদুটো দরদর করে ঘামছে। প্রচণ্ড জোরে চার্জ করছে। পা তুলে দিচ্ছে মুখের ওপর।। কানের পাশে কাটারির মতো কোপ মারছে। এত কিছু চলছে কিন্তু কারো গায়ে হাত লাগছে না। পেছনের কোনো বাড়ি থেকে জেনারেটারের শব্দ আসছে। এদিকে ওদিকে দু-একটা জোনাকি। হাঁ করেছিলাম বলে মুখে মশা ঢুকে গিয়েছিল আমার। থুথু ফেলে বের করতে হয়।

আর একটু এগোতে ছোট একটা পার্ক পড়ে। দোল্না, ঢেঁকি সব থেমে রয়েছে। পার্কটাকে ঘিরে একসার একরকম দেশলাই বাক্সের মতো বাড়ি। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে ছোট বাগান রয়েছে। কোনার একটা বাড়িতে বাইরের ঘরে ব্যাটারিতে টিভি চলছে। টিভির নীলচে আলো একদিকে দেওয়ালজোড়া লেনিনের ছবির ওপরে কমছে বাড়ছে। কখনো কখনো ছবিটা প্রায় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কোনো লিডারফিডার থাকে, হবে।

হাঁটতে থাকি।কাল্মন আর মোগলাই, আমরা এগোই।রাস্তায় লোক নেই।ফাঁকা বেবাক। সান্নাটা। কাকে ছেনতাই করব? যাদের দেখছি তাদের ছেনতাই করা যায় না। তবে ছেনতাই করা যায় কাদের? তাদের কখন পাওয়া যায়? চোর? আছি ভাই। ছেনতাইবাজ?

ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আলগা ছোবল মারে। চুমোয়। আমাদের চোয়াল, আলটাকরা, জিভ, ঠোঁট কেমন অসাড় হয়ে যায়। কুয়াশায় চুবিয়ে রেখেছে এই বেফয়দা রাত। ফালতু। বেকার। কোনো বাড়ির মাথায় ডেকে উঠল প্যাঁচা। তার ঝটপটে ফ্যাকাশে উড়ে যাওয়াও দেখা যায়। আমরাও ভাগ্যকে লড়িয়ে দিয়েছি শিকারের খোঁজে। গয়না পরে ইঁদুর বা ব্যাঙ এখনো আসেনি। তিন-চারটে কুকুর আমাদের পেছনে চলতে শুরু করে। আমরা ইট, পাথর কুড়োই। কুকুরগুলো আর এগোয় না। কিন্তু ডাকতে শুরু করে। ওপরের দিকে মুখ তুলে ককিয়ে ওঠে। চাঁদের মুখের মধ্যে মেঘ ঢুকছে। কোথাও একটা মোটরসাইকেল স্টার্ট দিল। হাসল কেউ? আমরা কিন্তু হাঁটছি। এত হাঁটছি যে ছেনতাইয়ের কথা প্রায় ভুলে গেছি। আমার থাইতে কলের বেঁকা নলটা ফুটছে। কেডসের ভেতরে পা চুলকোচ্ছে, ঘামছে। ঠাণ্ডা মরা ল্যাম্পপোস্টে গাল ঠেকাতে, কপাল ঠেকাতে ইচ্ছে করে। জলতেষ্টা পেয়েছে। আমাদের কলোনির পাশে একটা বড় পুকুর আছে। আমরা বলি বিল। জোর মেঘ ডাকলে কইমাছ উঠে আসত। আমরাই

দেখেছি। ওখানে মাটি ফেলে বুজিয়ে আটতলা বাড়ি উঠবে। খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। কাল্‌মন গুন গুন করে গান করছে। ওরও কি ছেনতাইয়ের কথা মনে নেই? অসাড় ভাবটা নামছে। শিরদাঁড়ার হাড়ে হাড়ে পা রেখে রেখে নামছে। চোর? আছি ভাই। ছেনতাইবাজ?

হেডলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি হুড়ুম করে এসে জোরে বাঁক নেয়। আমরা তড়বড় করে দুপাশে দুজনে সরে যাই। আমাদের দুজনকে আলাদা করে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে যায়। গাড়ির চোখ ধাঁধানো আলোয় রাস্তার ওপারে কালমন্‌কে ছিটকে যেতে দেখে আমার মনে হয় ওকে যেন চলন্ত গাড়ির ভেতর থেকে কেউ গুলি করল। সিনেমায় এরকম দেখা যায়। কলের বেঁকা নল আমার পকেটে। আমরা ছেনতাই করতে এসেছি কোয়ার্টারে। এখনো পারিনি।

কত বাড়ি রে ভাই। আন্দাজ আসে না। যেমন আন্দাজে আসে না হাজত, কোর্ট, থানা। কত থানা বানিয়েছে। এত থানা যদি, এত পুলিশ, তাহলে চোর কত? সবাই? এই বিরাট এলাকার মধ্যে এক এক রকমের বাড়ির ফাঁকফোঁকর দিয়ে এঁকাবেঁকা রাস্তা বরাবর—সাবধান! জিগজ্যাগ রোড—একশো ফুট দূর থেকে সিগনাল দিয়ে সাবধানে দিনের বেলা হর্ন, রাত্তিরে আলো, হর্ন দিয়ে যাবেন—আমাদের পা ব্যথা করছে—ঠ্যাংঠেঙে চারটে পা, দুখানা জিরজিরে ইঞ্জিন—ক্লাচ, ব্রেক অন্যের পায়ে রয়েছে—এই এসে গেছে দুরন্ত তুখোড় বাঁক বা হেয়ারপিন বেন্ড—সাবধান—থানার পর থানা—আবার দিনের বেলা হর্ন, রাত্তিরে আলো, হর্ন, একশো ফুট দূর থেকে সিগনাল দিয়ে সাবধানে—ঠা ঠা করে আলো ফিরে আসে—বাড়িতে বাড়িতে আলো দপ দপ করে এঘরে-ওঘরে জ্বলে ওঠে—অন্ধকার টুকরো টুকরো হয়ে গাছের ফাঁকে, বেড়ায়, আনাচেকানাচে ছিটকে যায়। বাচ্চারা চেঁচায়। টিভি-র আওয়াজ, স্টিরিও-র আওয়াজ রেডিও-র আওয়াজ, গাড়ির আওয়াজ। কাচের শব্দ করে জানলা খোলে। বন্ধ হয়। হাসির শব্দ, কথার শব্দ চারদিকে একেবারে হাট বসিয়ে দেয়। লোকজন বেরিয়ে আসে। বাচ্চা নিয়ে বাবা-মা বেরোয়। কেউ আমাদের পাত্তা দেয় না। এত আলো, মার্কারিগুলো রাস্তার ধারে ঝিমোচ্ছিল, এখন তেতে উঠছে। আমাদের কি দেখাই যাচ্ছে না?

আমরা ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে চলছি। হেঁটে-হেঁটে থকে গিয়েছি। কেউ আমাদের কদর করছে না। বাদ দিয়ে দিয়েছে হিশেব থেকে। অথচ অন্তত একটা ছুরি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সেটা নিয়ে কেউ ভাবছে না। চারদিকে কুকুর ডাকছে। কিছু রাস্তার কুকুর। বাকিগুলো বাড়ির পোষা। ল্যাম্পপোস্টের তলায় একটা সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চিতে আমরা বসি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছনের বাড়ির গ্রিলের ভেতর থেকে রাশভারী আওয়াজ বেরিয়ে আসে—

"এখানে কী চাই?"

"কিছু না। আমরা একটু জিরাইতাছিলাম।"

"এটা বাইরের লোকের বসার জন্যে বানানো হয়নি।"

"দাদু, আমরা কাছেই থাকি।"

"কী?"

বুড়ো লোকটা বেরিয়ে আসবে এবার। আরো লোক বেরোবে। ঝামেলা হবে। চারদিকে আলো। আমরা উঠে আবার হাঁটতে থাকি।

"কেমন হারামি দেখলি? আমরা কোনো দোষ করছিলাম?"

"কর নাই? হালা ছেনতাই করতে আস নাই? পকেটে কী আছে? চিল্লামু?"

"ধরা পড়লে তুই য্যান বাদ যাবি। ছেনতাই করুম, ছেনতাই ভালো, তুই বলস নাই?"

গার্ডদের হুইসল শোনা যাচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টে লাঠির বাড়িও পড়ছে। এতক্ষণ কী নেপালিগুলো অন্ধকারে লুকিয়েছিল?

কোয়ার্টার ছাড়িয়ে আমরা মেন রাস্তায় উঠে পড়ি। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। দু-একটা সাইকেল চলছে। গাড়ির শব্দও আছে। গোঁ গোঁ করে একটা পুলিশের পেট্রল ভ্যান পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের পাত্তা না দিলেও মনে হল যেন একটু আস্তে হল আমাদের দেখে। আসলে রাস্তা খুবলে গাড্ডা হয়ে গিয়েছিল ওই জায়গায়। তবু ঝুটঝামেলা বাঁচাতে আমরা ধারের মাঠে উঠে পড়ি। দূরে কোয়ার্টারের আলো ঝলমল করছে।

"তুই হালায় ধুর, ছেনতাই করতে বুকের পাটা লাগে।"

"তরে আমি কই নাই আমারে দিয়া হইব না। তুই বা কী লোম্বাটা ছিঁড়লি? মোটকা লোকটারে দেইখা তো মুইতা দিলি?"

"হ, মুইতা দিলাম।"

"দিলি না?"

আবছা চাঁদের আলো। ঠাণ্ডায় কুয়াশার সঙ্গে ধোঁয়া আর ধুলোর মিশেল মাঠের ওপর থিতিয়ে রয়েছে। যে আসছিল তাকে দূর থেকে ভুতুড়ে দেখায়। মাঠ চিরে ভূত আসছে বা মানুষ আসছে। কাল্‌মন একবার আমার দিকে তাকায়। কাছে আসতে দেখা যায় লোকটা রোগা আর একটা পা একটু লেংচে চলে। পিঠে একটা বস্তা। বেশ ভারী। আরো কাছে আসতে আমরা লোকটার আধবুড়ো খোঁচা দাড়ি মুখটাও দেখেছিলাম। আমরা ওর রাস্তা আটকে সামনে দুজনে দাঁড়াই। ও ডানদিকে যেতে চেষ্টা করে। আমরাও সরে যাই। ও বাঁদিকে সরে। আমরাও রাস্তা আগলাই। কাল্‌মন বোতামটায় চাপ দিতেই ফস করে ছুরির ফলাটা বেরিয়ে আসে। আমার হাতে কলের নল।

—"টাকা পয়সা কী আছে বার কর হালায়।"

লোকটা মুখ হাঁ করে। ভয়ে পা-দুটো কাঁপছে।

—"পয়সা নেহি হায় বাবা। গরিব আদমি হ্যায়। ছোড় দিও বাবু···"

—"চুপ মার হালার মাউড়া। বস্তায় কী চোরা মাল আছে উপুড় কর··· নেহি তো···"

—"দেখ্ লেও বাবু কেয়া হ্যায়···"

বার বার ভগবানের নাম করতে করতে লোকটা ভারী বস্তাটা উপুড় করে ঢালে—পুরোনো তক্তার কাঠ, পেরেকমারা, লোহার মরচে পড়া অ্যাঙ্গেল, শিশি, ছোট ছোট প্যাঁচ-কাটা রড, ভাঙা পিঁড়ি, কয়েকটা শিশি, ছাতা-পড়া টিন, শিক, ফাটা সুইচ ইলেকট্রিকের পুরোনো তার—ভালো করে দেখবার জন্যে কাল্‌মন নিচু হয়। লোকটা ওর মধ্যে থেকেই একটা কাঁটা লাগানো তক্তা হঠাৎ আমার হাতের দিকে ছুঁড়ে মারে। আচমকা লেগে আমার হাত থেকে কলের নলটা পড়ে যায়। লাগে। তারপরই ও একটা শিক তুলে বনবন করে ঘোরাতে থাকে। কাল্‌মন সরে না এলে ওর মাথায় লাগত। লোকটা লাফায় আর চেঁচায় বিকট চিৎকার করে, থুথু ছিটোয়, খিস্তি করে। রাস্তায় টর্চের আলো জ্বলে ওঠে। বোধহয় একটা গাড়িও দাঁড়াল।

"লোক আইয়া পড়ব। দৌড় মার!"

আমরা বেদম ছুটতে শুরু করি। লোকটা আমাদের খিস্তি করছে আর চেঁচাচ্ছে।মাঠের এদিকটা উঁচুনিচু। আমরা লাফ মেরে মেরে ছুটি। দৌড়তে দৌড়তে আরো আরো অন্ধকারে সরে যাই। সাঁইবাবলার ভাঙা ডাল পায়ে লেগে কাঁটাতে প্যান্টের ওপর দিয়েও পা ছড়ে যায়। দৌড়! দৌড়!

শালা না হল গয়না, না হল নোট, এখন মুখে থু থু শুকোচ্ছে, বুক ধড়ফড় করছে—মুরগি রেস চলছে। খেলার মাঠের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি তারপর বিলের ধার দিয়ে ডাঁই করা শুকনো কচুরিপানা, মরা গুগলির খোলা মাড়িয়ে ধপ্ ধপ্ ধপ্ ধপ্—এ কী গলতা রে বাবা। হাতে জ্বালা করছে। রাগ হচ্ছে কাল্‌মনের ওপরেও। গ্যাস খেয়ে তোর বেলাইনে যাওয়ার দরকারটা কী? এর চেয়ে শালা পাম্পে গিয়ে গাড়ি ধুলে ভালো। এক-এক গাড়ি মাসে পনেরো টাকা, কুড়ি টাকা···ক্লাচ্, ব্রেক, অ্যাক্সিলেটার···ক্লাচ, ব্রেক···

আর দৌড়বার দরকার নেই। পেছনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু আমাদের তাড়া করছে না। কোনো চিৎকারও শোনা যাচ্ছে না। ভীষণ হাঁপাচ্ছি। শীত বাড়ছে। মাঠ পেরিয়ে আমরা পাড়ায় ঢুকি। আমাদের লাথিতে রাস্তার ধুলো ওড়ে। লোকটা এরকম করবে আমরা ভাবতেও পারিনি। দুজনের কেউই এ নিয়ে কোনো কথা বলি না। আমাদের মধ্যে তর্ক জমে ওঠে ডিস্কো ড্যান্স নিয়ে। কাল্‌মন বলে মিঠুন সবচেয়ে ভালো ডিস্কো নাচে। আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার। আমি বলি নামাকহালালে অমিতাভ বচ্চন দেখিয়ে দিয়েছে ডিস্কো ড্যান্স কাকে বলে। আমরা ছেনতাই করতে পারিনি। হাতে লেগেছে আমার।কেটে গেছে। তাতে কী?

কাল্‌মন ছুরিটা বের করে মাটিতে ফেলে রেখে ছুরিটাকে ঘিরে নাচতে শুরু করে। আমিও নাচতে শুরু করি। একটা একলা আধবুড়ো মাউড়ার কাছে ঝাড় খেয়ে যাওয়ার কথা কে মনে রাখতে চায়? আর তাতেই-বা কী? লোকটাকে আবার যদি কখনো একা পাই! আমাদের দুজনের চোখেই লোকটা আধলা ইটের বাড়ি খেয়ে থুবড়ে পড়ে যায়। তারপর আমরা দুজনে লোকটার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটার সারা মুখে রক্ত। তার ওপরেই আমরা লাথি মারি। আমাদের হাতে, ছুরি, বল্লম, পাইপগান। দুজনেই মুখ দিয়ে ইলেকট্রনিক বাজনার শব্দ করতে থাকি। কোমরের তলা থেকে অদ্ভুত ভাবে কাঁপতে থাকে আমাদের শরীর। মিঠুন আর মোগলাই। বচ্চন আর কাল্‌মন। বাঁচকে রহনা রে বাবা···বাঁচকে রহনা রে। আমাদের ঘিরে চাঁদ, রাস্তার আলো, এরোপ্লেনের আলো জ্বলে আর নেভে। তারা খসে পড়ে টুনি বাল্‌ব ফিউজ হওয়ার মতো। ডিস্কো লাইট।

১৯৮৫

পাঁচুগোপাল

পাঁচুগোপাল খুব নিরীহ লোক। ভোর চারটের সময় ও আর ওর বউ ফার্স্ট ট্রেন ধরে। তখনো অন্ধকারে লোক চেনা যায় না। ভোরের গাড়ি না রাতের গাড়ি। গতর টেনে কোনো ফিকিরে চড়ে বসলেই যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ঘুম সেরে পাঁচুগোপাল তার স্টেশনে নেমে পড়ে। বলা যায় এখান থেকে কলকাতার শুরু। কলকাতার আর এক ওভারব্রিজ জংশন বেপাত্তা রংবাজদের এলাকায় পাঁচুগোপালের বউ মৌরি ডালকলে কাজ করে। বউকে ছেড়ে দেয় পাঁচুগোপাল ট্রেনের হাতে। নেমে বিড়ি ধরিয়ে লাইন টপকে উলটো প্ল্যাটফর্ম দিয়ে উঠে আসে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে গণেশ দেবনাথের তিনশো রিকশার মধ্যে একটাকে পাঁচুগোপাল লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

পাঁচুগোপালকে আমি খুব ভালোবাসি। ও ঠাকুরের ভক্ত। লোকে গালিগালাজ করলে ও মুখ বুজে মেনে নেয়। এটাও লাইন হিশেবে সঠিক। কারণ দু-একটা কেস বাদ দিলে যারা বাজারে খিস্তিখাস্তা করে, একে ওকে চড়-চাপড় লাগায় তাদের হয় সিনার জোর নয় পার্টির জোর আছে। আজ যে খুচরো নেই বলে খচে গেল, চড় মারল কাল সেই মালফাল খেয়ে দশ টাকা দিয়ে দেবে। একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট হারামি কেউ নেই। থাকলেও ঠাকুর তাকে শাস্তি দেবে। পাঁচুগোপালের কাছে ঠাকুরের বই আছে। গলায় লকেট আছে। রিকশার পেছনে নিজের খরচে পাঁচুগোপাল ঠাকুরের নাম লিখেছে—শ্রীশ্রী—ঠাকুরের দয়ায় রিকশা চালনা করি ইতি পাঁচুগোপাল। সত্যি কথা বলতে এত স্পষ্ট করে নিজের বিশ্বাসের কথা অকপটে পাঁচুগোপালের মতো লোকরাই বলে। পাঁচুগোপাল কাউকে ঢপ দেয় না। অকারণে ভাট্ বকে বিরাট গেঁড়ে সাজতে চেষ্টা করে না। পাঁচুগোপাল তার বউকে ভালোবাসে। পাঁচুগোপালের বউ মৌরির চেহারা গড়ন সব যেমনটি হওয়া উচিত তার চেয়ে একটু বাড়তি হলেও এখনো তার বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। পাঁচুগোপালের মতে ওটা ঠাকুরের ব্যাপার। সবার সবকিছু হয় না। ঠাকুরের কল্যাণে দুজনার রোজগারে ভালোই চলে যায়। পাঁচুগোপাল কখনো খিস্তি করে না। একটা লোককেও হিংসে করে না। কিন্তু পাঁচুগোপালের গোপন কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চার

আছে। সেগুলো তার কাছে প্রায় রূপকথার মতো। সেগুলো আমি ছাড়া আপাতত কেউ জানে না। অবশ্য এই গল্পটা পড়ে ফেললে সকলেই জেনে যাবে। তাতে খুব একটা কিছু এসে যায় না। কারণ পাঁচুগোপালের আসল নাম আলাদা। তার বউয়ের নামও আলাদা। ঘটনাগুলোও কৌশলে ওলটপালট করা আছে। জানবার চেষ্টা করলেও উপায় নেই।

পাঁচুগোপালকে আমি খুব পছন্দ করি বললে ঘাটতি থেকে যায়। ওকে আমি প্রায় শ্রদ্ধাই করি মানে বেশ মান্য বলে মনে করি। এতই যে ভালো সেই পাঁচুগোপাল গত পনেরো বছরে অনেক কিছু দেখেছে। কংগ্রেস বনাম সিপিএম, সিপিএম বনাম নকশাল, নকশাল বনাম পুলিশ, পুলিশ বনাম সিপিএম, কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস—এসব তো হুদো হুদো ঘটনার সে সাক্ষী। এ তো গেল বড় ব্যাপার। এই জাতীয় টক্করে মার্ডার হলে, বডি পাওয়া গেলে, মাথা পাওয়া গেলে দোকানপাট বন্ধ হয়, রাস্তাঘাট খালি হয়, কাগজে বেরোয়, কত লোক জানতে পারে। কিন্তু ছেঁদো বা পাতি ক্রাইমও তো হয়। এক শালা মিনিবাসের ড্রাইভার বাসমালিকের বউয়ের সঙ্গে খুব পেখম মেলে হাওড়া-শেয়ালদা করছে। একরাতে ব্যাটাকে মাল খাইয়ে আউট করে, বোঝাই যাচ্ছে কে করতে পারে, রেললাইনে পেতে দিয়ে গেল। দুটো পা, ধড় ও থ্যাঁতলানো মুণ্ডু, কাটা হাত। তার পরদিন রহস্যময় এক পদ্ধতিতে পলিটিকাল কেস হয়ে গেল। আবার সেই গ্যাঁজগ্যাঁজানির ফেনাও থিতিয়ে গেল। পুরো কারবারটা ওয়াচ করে গেল পাঁচুগোপাল। এইভাবে সে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তবে আমি দেখেছি মৃতের প্রতি পাঁচুগোপালের বড়ই এক আন্তরিক ও জ্যান্ত টান রয়েছে। অনেক যুবকের মৃতদেহের সঙ্গে সে শ্মশানে গেছে যেখানে যেতে বুকের পাটা লাগত। ঝক্কি থাকত। এ তো আর পুতুলখেলা নয়। জ্যান্ত মানুষের মরা পুতুল। তাকে গুলি করা হয়েছে বা পিটিয়ে খুঁচিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। পাঁচুগোপালের এই সিভিক কারেজ আছে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটা কথা বললে বোধহয় পাঁচুগোপালের নিন্দে করা হবে না। ওর চেহারাটা এমনই নিরীহ ও করুণ যে ও যদি ইলেকট্রিক চুল্লির দোরগোড়ায় উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে কোনো সার্জেন্ট, কমিশনার, ডিসি, ডিডি কারো বোঝার ক্ষমতা নেই যে পাঁচুগোপাল একটি নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থান থেকে এখানে এসেছে। মনে রাখবেন মাঝরাতে বা অনেক সময় প্রায়ই শ্মশানে যাওয়া আজ থেকে বছর চোদ্দ-পনেরো আগে খুব সহজ ছিল না।

এখন তার নাম হয়েছে ফোয়ারা। ফোয়ারা বেশ্যা। অনেকেই অবগত নন যে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে একটি পট্টি রয়েছে। কালীঘাটের, টালিগঞ্জের বা লকার মাঠের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে চালাক সেজে লাভ নেই। সেখানে ফোয়ারা রোজগার করে। পাঁচুগোপাল তার খোঁজখবর রাখে। কারণ আর কিছুই নয় সে তার পাশের গ্রামের মেয়ে। অনেকদিনের চেনা। এই ফোয়ারার গল্প একবার লিখে আমি ফোয়ারাকে সভ্য সমাজে পরিচিত করতে ও নিজের নাম ফাটাতে চেষ্টা করেছিলাম। কোনোটাই হয়নি। যাই হোক ফোয়ারা সেখানে এক বুক চওড়া এক গলিতে এক পা কাদার মধ্যে বসানো ইটে রেখে অন্য পার গোড়ালি দিয়ে দেয়ালের শ্যাওলা ঘষে চলেছে। এবং নিজস্ব নিজস্ব করে তার একটা সৌন্দর্যও আছে। পাঁচুগোপাল মাঝেমধ্যে সেখানে যায় এবং ফোয়ারাকে বিনা পয়সায় রিকশায় বসিয়ে কয়েক পাক ঘুরে আসে, হাওয়া খাওয়ায়। পাঁচুগোপাল বিনা ভয়ে তার বউকে সবটা বলেছে। ও মিথ্যে কথা বলে না। ওদের এই বন্ধুত্বের ব্যাপারটা বেশ সাহসের। ওখানে পাঁচুগোপালকে সকলেই সজ্জন মানুষ ও

ঠাকুরের সেবক বলে জানে। দাঁড়িপাল্লার দুনিয়ায় এটা কম কথা নয়। অপ্রকাশিত থাকুক ফোয়ারা ও লেখকের সম্পর্ক।

এমনই যে পাঁচুগোপাল সে কিন্তু একবার বেপরোয়া রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল এবং বিশেষ একটি কাজের জন্যে সিটের তলায় গামছায় জড়িয়ে একটি দেশী রিভলভার আমার এক মুখচেনা লোকের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কথাটা ছিল পৌঁছে দেবার। কিন্তু তার পরের ঘটনাটাই কেচ্ছা।

তখন ঘোর শীত। বাদা অঞ্চলের একটি গোপন কারখানা থেকে মালটি পাঁচুগোপাল এনেছিল স্যাম্পেল হিশেবে দেখানোর জন্য। বলাই বাহুল্য যে পাঁচুগোপাল তখন ভেবেছিল যে এই রিভলভার গর্জে উঠবে গরিবের স্বার্থে। কারণ খাওয়া পরার অভাব ও নিত্য অনিশ্চয়তা এত থানাপুলিশের বন্দুকের জোরে বজায় থাকে যে জ্যোৎস্নায় অল্প কাদা হলে চাঁদের টানে মাছ যেমন খেপে যায়, ঘুরপাক খেতে থাকে তেমন মত্ত না হয়ে উঠলে চলবে না। গামছায় মোড়া ঠাণ্ডা নল হাতে টের পেয়ে পাঁচুগোপাল তো ঢুকে পড়েছিল। বিশারদকে দেখাবার জন্য পাঁচুগোপাল একটি বুলেটও এনেছিল। অনেকটা ছোট মাপের লিপস্টিকের মতো দেখতে। মৌরি লিপস্টিক বলে না, বলে ঠোঁটমিষ্টি। কিন্তু সে যে কি বিশ্রি ও বদ্‌খত রিভলভার যে ভাষায় এর নিন্দে করা সম্ভব নয়। প্রথমত নলচে যে কি টেম্পারের লোহায় তৈরি তা ভগবান জানে আর বিদঘুটে কাঠের বাঁট, ঘষে গেলে কাঠের আঁশ বাঁশের চোঁচের মতো ফুটে যেতে পারে। এবং একটা গুলি ফুটোলে পরের ফুটোতে গুলি ভরে গরম চেম্বারটি ঘুরিয়ে কাঁটার লাইনে আনতে হবে। বিশারদ দেখল মালটি অত্যন্ত ভারী এবং এর থেকে ফায়ার করা অসম্ভব কারণ ট্রিগার ঘিরে যে গোল পাতটা আছে তার মধ্যে আঙুল ঢোকে না। এমনই ব্যাদড়া কড়া স্প্রিং যে ট্রিগার নড়ে না। পাঁচুগোপাল জানতে পারল যে এরকম রদ্দি ও খাজা মাল চলবে না। এই হাই রিস্ক নিয়ে এরকম বিকট জিনিশ আনার কোনো দরকার নেই। অতএব বিমর্ষ পাঁচুগোপাল ফের সেই বিরাট ও বেঢপ হাতবন্দুক নিয়ে রওনা দিল। কিভাবে সে ফেরত গিয়েছিল বলে লাভ নেই, ধৈর্যে কুলোবে নাা। যাইহোক, পাঁচুগোপাল বশীর নামধারী সেই ওস্তাদের ডেরার চারদিকে পুলিশ দেখে কোনোমতে উধাও হয়েছিল। এবং তখন একটি জায়গায় সেই হাস্যকর মারণাস্ত্রটিকে বিসর্জন দিয়েছিল যেখানে পুলিশ কখনো যাবে না কারণ সে জায়গাটি বড়ই জটিল। সেখানে চারদিকে লক্ষ লক্ষ মুণ্ডু সোঁদা হাওয়ায় পচছে। মুণ্ডুগুলো কিন্তু মানুষের নয়। চিংড়ির। চিংড়ির ধড় এক্সপোর্ট হয়। মুণ্ডু হয় না। অতএব মুণ্ডু ফেলা হয়। লক্ষ মুণ্ডুর তলায় এখনো হয়তো কিম্ভুত সেই রিভলভার রয়েছে। পাঁচুগোপাল এই ঘটনাটি মাঝে মধ্যে ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় ভাবে ও ঘামে। এও বোধহয় ঠাকুরেরই ইচ্ছা। পাঁচুগোপালের সঙ্গে তার ঠাকুরের এরকম কাল্পনিক কথোপকথন হয়তো হয়।

—পাঁচুগোপাল, আজ কি করলি বল।

—আজ্ঞে, আজ ঠাকুর আপনারে স্মরণ করিচি।

—করেচিস?

—হ্যাঁ, ঠাকুর।

—দুনিয়ার মতিগতি কি বুঝলি?

—আমি কি বুঝব ঠাকুর। অশিক্ষাত লোক।

—এটা কিন্তু মনের কথা বললি না।

—মনের কথা কেউ বোঝে না ঠাকুর। মন বড় দুঃখ পায়। কষ্ট পায়।

—আমারও পেত।

—বন পোড়ে সবাই দেখে ঠাকুর। মন পোড়ে কেউ দেখে না।

বর্ষায় পাঁচুগোপাল ভিজে ভিজে রিকশা চালায়। হাওয়ার দমকায় রিকশা টানাই যায় না। প্যাডেল হড়কে যায়। এরকম এক বৃষ্টির রাতেই আমার সঙ্গে পাঁচুগোপালের প্রথম আলাপ। লোডশেডিং। কুপকুপে অন্ধকার। আমরা কিন্তু ছোট রাস্তা দিয়ে ঝকঝকে আলোয় এলাম। অথচ পাঁচুগোপালের রিকশায় আলো ছিল না। পাঁচুগোপাল একট প্রাইভেট গাড়িকে কিছুতেই সাইড দিচ্ছিল না। সাইড দিলে তো আর হেডলাইটের আলো পাওয়া যাবে না। বড়লোক আলো দেখাবে। গরিব উতরে যাবে। এ আবার কোথাকার লাইন?

পাঁচুগোপালের দারুণ ইচ্ছে যে সে রিকশা চালিয়ে টাকা জমিয়ে তার দেশে চলে যাবে। সে বড় অদ্ভুত দেশ। খালি মাঠ আর মাঠ। গাছপালা কম। সেই মাঠের মধ্যে কোথাও বিড়ির দোকান বানাবে। অনেক হাটুরে ওই মাঠ ভাঙে। তারা কিনবে। অবশ্যই পাঁচুগোপাল এ মাঠে দাঁড়িয়ে তারা খসে পড়া দেখেছে। দেখে থাকতেই পারে। তবে ওর বুদ্ধি চট করে উপস্থিত হয়। তারা খসে পড়া দেখতে নেই। অমনি পাঁচুগোপাল চোখ বন্ধ করবে।

মজা ভেড়িতে একসময় নরম কাদায় খোঁটা পুঁতে, মাচা বানিয়ে বোমা বাঁধার কারবার বসত। ঘষ ঘষ করে পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে সুতলি দড়ি এসে কেরাসিনে ভেজানো মোমছাল পটাশের পরাণপুঁটুলির চারপাশে জড়ায়—এই ঢুকে গেল পেরেক, লোহার কড়াই ভাঙা, বলবিয়ারিঙের গুলি—আবার সুতলি জড়ায় ঘষঘষ করে। বিড়ি বাঁধার মতোই সহজ ব্যাপার। সেখানে মেছোকালীর হাতে বোমা ফেটেছিল। পেট ঝলসে, হাত উড়ে, চোখ বেরিয়ে ঝুলছে। মেছোকালী চেঁচায়—মা! মাগো! পুড়ে যেতেছে! বাঁচাও গো। তালগাছতলায় ভিড় হয়ে যায়। পাঁচুগোপাল খবর পেয়ে মাঠ ভেঙে দৌড়ে ভীমের দোকানের তক্তা সরিয়ে দুবোতল রসা ডিস্টিলারির কানট্রি স্পিরিট বা দেশী মদ হাতিয়ে নিয়ে দৌড়য়। দূর হটো তো সব। দেখছ না বেদনায় কেমন করতেচে মানুষটা। ঢক ঢক করে মেছোকালীর মুখে মাল ঢালে পাঁচুগোপাল। ঢেলেই চলে। মেছোকালীর টাকরা তালু সব ঝিমঝিম করে। ছটফটানি কমে আসে। সবাই ভাবে টেঁসে গেল। কিন্তু মানুষের জান তো আর দান-খয়রাতির বস্তু নয়। অচৈতন্য মেছোকালীকে রিকশায় তুলে পাঁচ পাবলিক ছুটতে থাকে ডাক্তারখানায়। হাসান ডাক্তার জল ফুটোতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে একজন কলাপাতায় মুড়ে মেছোকালীর আঙুল এনেছিল। ফেলা গেল। মেছোকালী কিন্তু কোটরকানা আধপোড়া মুখ নিয়ে নুলো হয়ে বেঁচে রইল। হাসান ডাক্তার পাঁচুগোপালের বুদ্ধির তারিফ করে।

—বুদ্দি করে মদটুকু খাইয়েছিলি বলে কত কম হুজ্জুতি হল বল দিকি।

—না মানে ভাবলাম জ্ঞান থেকে কষ্ট পাচ্চে তো।

অজ্ঞান থাকলে কষ্ট কম। ঠাকুরের ওপর অটল বিশ্বাসে পাঁচুগোপাল অজ্ঞান। তাই তার কষ্টও কম হয়। তবে নিজের কষ্টটুকুই। অন্যের কষ্টে পাঁচুগোপাল চুপ করে থাকে না। পাঁচুগোপালকে কতবার আমি ঝামেলা ফৈজতের এই পথ থেকে সরাতে চেষ্টা করেছি। খচ্চর না হলে করতে পারবে না এমন কাজ জোগাড় করে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছি। লাভ হয়নি। অন্যের কষ্ট দেখলে পাঁচুগোপালের সাহস মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

কুষ্ঠ হাসপাতালের ফালতু জমি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা পনেরো ইঞ্চি চওড়া পাঁচিল আছে। সেখানে আমাদের এলাকার নেতারা পা ঝুলিয়ে বসে তিলজলার টোকো চোলাই খায়। ঢিমেতালে হাওয়ায় হাওয়ায় আমেজ আসে বলে এই মালের নাম আছে। এখানেই কে কোথায় টিউবওয়েল বসাবে, রাস্তা খুঁড়বে বা মাটিসিমেন্ট সাপ্লাই দেবে সব ঠিক হয়। সেখানে গিয়ে একরাতে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো রিকশা নিয়ে পাঁচুগোপাল এসে হাজির।

—বাবু আপনাদের দুপায়ে পড়ি। এক্কুনি চলেন।

—কেন রে? কি হল?

বাবু সে হবে আপনাদের সব ছেলেরা প্লাটফর্মের ওপরে এট্টা ছেলেরে, হায় ভগবান, সে কি পেটনই দিচ্ছে। ছেলেটাকে বাঁচান।

—কেন? মারছে কেন?

—ছেলেটা দোষ করেচে বাবু। ওর কাছে চোলাইয়ের ব্লাডার ছিল। তরকারির ঝুড়ির তলায়।

বিভিন্ন দলের নেতাদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সমাজবিরোধী কর্মসূচি চলছিল। সেই ক্যাডারদের হতে রিকশা স্ট্যান্ডে একটা ছেলে ধরা পড়েছে। তার কাছে চোলাইয়ের ব্লাডার ছিল।

মারতে মারতে ছেলেটাকে উদোম ন্যাংটো করে খোয়ারাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে। ওর বুকে ব্লাডার ঝোলানো। চারপাশ থেকে বেদম মার চলছে। ঠোঁট ফেটে ছিঁড়ে ঝুলছে। রক্ত গড়াচ্ছে সারা শরীর দিয়ে। ছেলেটা কয়েক পা করে হাঁটছে। পড়ে যাচ্ছে। লাথি খেয়ে আবার উঠছে। ছেলেটাকে ওরা একটা কথা বার বার শ্লোগানের মতো করে বলাচ্ছে—

—আমি চোলাই বিক্রি করি, ব্লাডার আমার বুকে। আমি চোলাই বিক্রি করি।

এইসব সময় মার কখনো থামে না। যখন লোকটা মরে যায় সেটা বোঝার পরেও অনেক সময় মার চলতে থাকে। অনেক লোক মিলে মারছে। সমাজের থেকে এই সাংঘাতিক পাপীটাকে দূর করা একান্ত ও চূড়ান্তভাবে দরকার। এটা ভালো কাজ। দরকারী কাজ। অনেক লোক যারা ট্রেন ধরবে তারা দেখছে। লজ্জা লাগে তবু মেয়েরাও দেখছে। শিশুরাও দেখছে। শিশুদের এরকম দৃশ্য দেখা খুবই জরুরি কারণ এর ফলে তাদের সামাজিক সচেতনতা আরো বাড়বে। ভবিষ্যতে কোনো পাপীকেই তারা রেয়াদ করবে না। প্ল্যাটফর্মের পেচ্ছাপখানার সামনে ছেলেটা আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বল শুওরের বাচ্চা—

—আমি চোলাই বিক্রি করি, ব্লাডার আমার বুকে। আমি চোলাই বিক্রি করি···

ওরা ছেলেটাকে প্ল্যাটফর্মের শেষটা যেখানে ঢালু হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছিল। একটা লোহার রেলিং ভাঙা টুকরো ওরা জোগাড় করেছিল। সেটা গলার ওপরে রেখে দুপাশ থেকে দুজনে চাপ দেবে পা দিয়ে। কিন্তু ওখানে তখন পাঁচুগোপালের রিকশায় চড়ে দুজন নেতা এসে গিয়েছিল।

পাঁচুগোপাল ঠাকুরের লকেট চেপে ধরে। ঠাকুর তাকে সারাদিন রিকশা চালাবার জোর দিয়েছেন, ঠাকুর তাকে জলমুড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ঠাকুরই তাকে এই ওভারব্রিজে তুলছেন, এই মাটিতে আছাড় মারছেন। ঠাকুরের ইচ্ছাতে রিকশার চেন খুলে যায়। রবার টিউব ফাটে। অথচ দিন তো চলে যায়। তাই-বা কম কি?

পাঁচুগোপালের কারো ওপর রাগ নেই। পুলিশের ওপরেও না। অথচ সেই পুলিশ এসে বিনা কথায় বিনা দোষে রিকশার সিট তুলে নিয়ে চলে গেল। সিট ছাড়াতে পাঁচুগোপাল থানায় যেতে ভাগ্যে জুটল লক্‌আপ। পাশের ঘরে ছেনতাইদের পিটুনি চলে। সারারাত চিৎকার গোঙানির। পাঁচুগোপাল, একটা চোর আর একটা রেপ কেস লক্ আপে রাত কাটায়। পেটি কেসে ফাঁসে। সেখানে অনেক আসামির মেলা বসেছে। পাঁচুগোপাল সব মিলিয়ে আশি টাকা খরচ করে পুলিশ আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে সিট বগলে করে দুদিন পরে স্ট্যান্ডে এসে দেখে ডালকলের কাজ ছুটি করে মৌরি তার খবর নিতে এসেছে। দুজনে খুব খুশি।

পাঁচুগোপাল ফলিডল খেয়েছে, শুনেছেন? হতেই পারে না। আত্মঘাতী সে কি করে হবে যে নিজের কথা ভাবে না। অবশ্য দুশ্চিন্তা থাকে। সেই বিদঘুটে রিভলভার যদি পুরোনো বন্ধুর মতো ফিরে আসে? আসলে ওর বুকের খাঁচায় রিভলভারের পাখি পোষা আছে। মাঝে মাঝে ঝটপট করে। টাকা জমালে ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে একটা নতুন রিকশা বার তো করাই যায়। মালিকের রেট তিন টাকা থেকে দেড় লাফে পাঁচ টাকা হয়েছে। নতুন রিকশার দেড় হাজারের কমে ঘোমটা খুলবে না। তবে গ্যারান্টি দেবার লোক চাই। মৌরি সেই রিকশায় চড়বে। ফোয়ারাও চড়বে। পুলিশ এসে যখন তখন সিট নিয়ে যাবে। পেটের মধ্যে ডিম ফেটে পালক উড়বে মেছোকালীর। মাঠের মধ্যে বসে পোড়া মুখের গর্তে মদ ঢালতে হবে। সমাজ-বিরোধীকে বাঁচাতে ছুটতে হবে সমাজপতিদের ডেরায়। ঠাকুরের লকেট ঝুলছে গলায়। কি উপায়?

না। ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নয়, গ্যাস চেম্বারে বা ইলেকট্রিক চেয়ারেও নয়। হাসপাতালে তো ভাবাই যায় না। আমার কল্পনায় পাঁচুগোপালের মৃত্যু হবে এইভাবে। অবশ্য ঘটনাটা সে নিজেই কিছুটা আমাকে বলেছে।

একটা খাল আছে। কানাখাল হলেও তাতে জল টলটল করত। মাছ হত। এখন তার গোটা জল নষ্ট, কালো। তার দুপাড় দিয়ে বিরাট চোলাই তৈরির কারখানা গমগম করছে। মালিক আছে, পুলিশ আসে। পুলিশ আসে, অনেক লোক কাজ করে। তারা মাথায় বড় বড় জেরিক্যান ঝুড়িতে বসিয়ে টেম্পোয় গিয়ে মাল লোড করে। রিকশা-ভ্যানে তোলে। সেই মাল কলকাতায় চলে আসে। ইথাইল অ্যালকোহলের সাপ্লাই নেই বলে দিশী মদ বা বাংলা মাল এখন পাওয়া যাচ্ছে না। ডিস্টিলারিগুলো কিছু সেন্ট দেওয়া রং করা মদ বাজারে ছাড়ছে। ঝানু খদ্দেররা ওতে পটে না। চোলাই এখন ক্যাপচার করছে বাজার। করুক গে যাক, ওই কানাখালে ডিস্টিল করার পর বাতিল নানারকম জিনিশ ফেলা হয়। খালের জল এখন কালো হয়ে গেছে। ওপরে বিষের সর ভাসে। সেই নষ্ট জলে সূর্যের ছায়া গ্রহণের মতো দেখায়।

পাঁচুগোপাল একদিন ওই খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে জলে নোংরা ফেলা বন্ধ করতে বলবে। ওরা শুনবে না। ওকে ধরে মালিকের কাছে নিয়ে যাবে। মালিক জানতে চাইবে ও চোলাই কারখানায় কাজ চায় কিনা। পাঁচুগোপাল ভ্যাটের জালায় থান ইট মারবে। ওরা তখন পাঁচুগোপালকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। ও মরবে চোলাইয়ের মালিকের পায়ের তলায়। রক্ত বেরোবে ওর মুখ দিয়ে। ও মরবে।

সুখের কথা যে পাঁচুগোপাল এখন মরেনি। এখনো ও নিজের মতো করে বেঁচে আছে। পাঁচুগোপাল যেভাবে বেঁচে আছে চলতি সমাজের হিশেবে সেটাই ভালো থাকা বা ভালো হয়ে থাকা। কিন্তু এভাবেই যে সে সব সময় চলবে তেমন নাও হতে পারে।

অভিজ্ঞতা, ভুলচুক থেকে ও হয়তো ভেতরে ভেতরে কিছু ঠিক করছে। অতএব ভবিষ্যতে সে কি করে দেখা যাক। অনেকদিন হল আসছে না। ওর কথা দেওয়া আছে আমাকে একবার বাদায় নিয়ে গিয়ে বনবিবির পালা শোনাবে। তবে পুজোর আগে যে একবার দেখা করবে সেটা আমি জানি। আরো সুখের কথা যে দেখা করবে তার নাম পাঁচুগোপাল নয়।

১৯৮৫

এক টুকরো নাইলনের দড়ি

—'সবাই যখন ধরেই নিয়েচে যে হাল্লাক হয়ে পড়েচি, চারদিক থেকে বুঝলেন ব্যাড টাইম ঘিরে ধরেচে, এদিকে বড় করে ঘোমটা দিতে যাই তো ওদিকে সব বেরিয়ে পড়ে, মানে আত্মীয়, ফ্রেন্ড, কলিগ যখন সবাই, সবাই জেনে গেছে যে ফৌৎ—ঠিক সেই সময়ে বুঝলেন—আপনারা অবশ্য জানেন না— পুরো পিকচারটা পালটে দিলুম, মানে পালটে গেল—দৈবের খেলাই বলতে পারেন—'

—'লটারি পেয়ে গেলেন, আজকাল যেমন পাচ্ছে লোকে?'

—'লটারি! লটারির বাবা। লটারি তো স্রেফ পাত্তি কে পাত্তি। ললাটে কিছু থাকলে লটারি কিছু করতে পারবে? আমাদের পাড়ায় জানেন এক ব্যাটা তেলি মেঘালয় মেরে দিয়েচে। কি গুমোর এখন ব্যাটার।'

—'পাথর, কবচ কিছু পেয়েছিলেন?'

—'না। বলচি। আচ্ছা সার, আপনার জন্মতারিক কি পাঁচ?'

—'পাঁচ কেন হতে যাবে? তেইশ।'

—'হাঃ হাঃ একটা সিগারেট খাব? খুব ভালো দেখতে বাস্কট্যা।'

—'খান না।'

—'তিন আর দুয়ে কত হয়?'

—'পাঁচ।'

—'জানতুম। গাড়ির নম্বর দেখেই বুঝেচি এইট টু ফোর জিরো। নিউম্যারোলজি করলে পাঁচ। পাঁচ হল আপনার লাকি নাম্বার। তবে কি জানেন সার—লাইফটা হল ঘুড়ির মতো, এই লাট খাচ্ছে, ঢিলি প্যাঁচ চলেছে, হঠাৎ দেখলেন আপনার ঘুড়িটা কেমন তরতাজা হয়ে উঠল। সুতোর টান জানিয়ে দেবে আপনাকে। মানে অন্য ঘুড়ি তখন ভোকাট্টা। তবে যতই উড়ুন, যতই লুটুন ছোটখাটো খুচরো কার্ণিক কিন্তু খেতেই হবে, যতই লাকি হোন না কেন। এই তো দেখুন না ছেলেটা আচমকা পেটে চোট পেয়ে গেল। ডাক্তার বলচে ভয়ের কিছু নেই তবে আটচল্লিশ ঘণ্টা তো যাওয়াতে হবে—তবে

তারপরেও কিছুদিন রাখবে বলেচে—'

—'শুনলাম তো ফুটবল খেলতে যেয়ে লেগেছে।'

—'ভালো খেলে বুঝলেন। গোলকিপিংটা সত্যি বোঝে। অনেকটা সেই তরুণ বোস স্টাইল। ভয়ডর নেই। কত জায়গা থেকে তো ডাক পড়ে। পয়সা দিয়ে দিয়ে খেলতে নিয়ে যায়। ভালোমন্দ খাওয়ায়। সামনের বছর দেখবেন সেকেন্ড ডিভিশন খেলবে। মাথা খুব ঠাণ্ডা।'

—'লাগল কী করে?'

—'ওই যে বললাম, ভয়ডর নেই। এমনভাবে স্টাইকারের পায়ের ওপর থেকে বল তুলে নিয়েচে যে লাথিটা পড়েচে পেটে। আর পেট যা নরম জায়গা। ওর খেলা দেখে ভাস্কর কী বলেছিল জানেন তো—ব্রাইট ফিউচার।'

ঘড়িতে দেখলাম রাত তখন একটা। বেশ কিছুক্ষণ লোকটার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। খারাপ লাগছে না কিন্তু অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্বস্তির কারণ হল সঙ্গে ফ্লাস্কে লিলি কফি করে দিয়েছিল। খেতে পারছিলাম না। একা একা খাব কী করে? বাড়তি কাপও নেই যে ওকে দিতে পারি।

হাসপাতালে রাত জাগা যদিও নতুন নয় তবে অনেকদিন পরে তো, নতুন নতুনই লাগছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি জমছিল গাড়ির কাচে। বেশ হাওয়াও ছিল। ঝোড়ো বাতাস। সামনে শেডের তলায় একটি কমবয়সী বউ কেঁদেই চলেছে সেই কখন থেকে। কখনো ফুঁপিয়ে, কখনো জোরে। পাশে একটা বুড়োমতো লোক। মেয়েটা কিছুতেই ভেতরে যাচ্ছে না। মার্কারি আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছটা, আরো কি কি গাছ—দারুণ দেখাচ্ছে। বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার একটা ডাল নুয়ে পড়ে ঢেউ খেলানো টিনের ওপর মুখ ঘষছিল। রাস্তায় ছেঁড়া পাতা, ফুল সব কাদায় থোকা থোকা হয়ে আছে। রাতের বাতাসে জলচিকচিকে পাতাগুলো খেলা করছিল। এমন আলোর সাজই আলাদা। এমারজেন্সির সামনে মাইকে কার যেন নম্বর ডাকল। বৃষ্টির মধ্যে দেখলাম ঘুমচোখে টলমলে পায় দুজন ছুটল ওয়ার্ডে। ওষুধ আনতে হতে পারে। নয় খারাপ খবর আছে। হয়তো মুখের ওপর ঢাকা পড়েছে শাদা চাদর। অনেক সময় কখন মরে যায় বোঝাই যায় না।

—'আপনার নম্বর ডাকলে শুনবেন কী করে?'

—'ঠিক বলেচেন তো? ওখানেই গিয়ে থাকি। কী বলেন? আপনি সার নিজেই বা জানবেন কী করে? আপনারও তো পেসেন্ট আচে।'

—'আমার লোক আছে ওখানে। অফিসের বেয়ারা।'

—'পেসেন্ট কি আপনার ফ্রেন্ড সার?'

—'হ্যাঁ। স্ট্রোক হয়েছে। কাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট থেকে ছেড়েছে। ভালোর দিকেই মনে হয়।'

—'আমি তাহলে সার চলে যাই। একটা কথা বললে মাইন্ড করবেন সার?'

—'না, না, কী বলুন না।'

—'আমার সার বড় ভয়। একটু ওই সিঁড়িটা অব্দি এগিয়ে দেবেন?'

—'এখান থেকে তো কয়েক পা। আলো জ্বলছে।'

—'পরে আপনাকে বলব সার। ভাগ্য তো আর এমনি ফেরে না। নিতে হয় কিছু। যেমন আমাকে ভয় দিয়েচে। দেখুন সার, হাতটা ভালো করে দেখুন। কাঁটা দিচ্চে। চলুন না সার। একটু তো।'

—'চলুন।'

—'গাড়ি লক করলেন না সার?'

—'এই তো সামনে। হাসপাতালের ভেতরে এত রাতে কে কী করবে?'

—'না সার। ভেতরে চোলাইয়ের কারবার। সব গুণ্ডা পার্টি, বুঝলেন? বাইরে যাওয়ারও ঝামেলা। মেয়েছেলে ফেয়েছেলে ঘোরে। কাল রাতে তিনটে মাতাল তো তাই নিয়ে মারপিট করছিল।'

—'ভেতরে?'

—'ভেতরে কী বলচেন? ওই মেন গাড়িবারান্দার তলায়। দারোয়ান ব্যাটা চুপ মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচে। বলতে গিয়ে মার খাবে?'

আমাদের বেয়ারা দফারাম দেখলাম সিমেন্টের সিটের ওপরে দলা পাকিয়ে শুয়ে। তবে ঘুমোচ্ছে না মটকা মেরে রয়েছে বুঝলাম না। ছোকরার ঘুম খুব সজাগ। পরশু রাতে স্বরূপকে ঠিক ডেকে দিয়েছিল। চারদিন হয়ে গেল সঞ্জীবের স্ট্রোক হয়েছে। অফিসে। ওর বউয়ের সঙ্গে রিলেশনটা ভালো নয়। অত্যধিক ড্রিংক করছিল কিছুদিন ধরে। কখনো নিজেকে বলে টার্গেট। কখনো ভিক্‌টিম। সামলে যাবে বলেই মনে হয়।

আজগুবি লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে তাও কয়েকটা কথা বলা গেল। চেহারাটা খয়ের খাঁ টাইপের—মোটার দিকেই। রংটা বেশ্ কালো। পুরোহাতা বুশ শার্ট আর খাকি প্যান্ট পরা। পায়ে কাবলি। চশমাটা ব্যাঁকা। একটা ব্যাপার অন্তত আমার পক্ষে বেশ বিরক্তিকর। লোকটা নস্যি নেয়। তবে রুমালে হাত, নাক মোছে এই যা রক্ষে। তা না হলে গাড়ির সিট নোংরা করত। লোকটার নাম জগদীশ পাল। বেলঘরিয়ায় থাকে। আগে কতরকম লোকের সঙ্গে আলাপটালাপ হত। হলে ভালো লাগে। এখন এই অফিস আর বাড়ি জড়িয়ে এমন একটা লাইফ হয়েছে যে রবিবার বাজারে না গেলে লোকের সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলা হয় না। মর্জিনা বলে একটা মেয়ে আছে। ওর কাছ থেকে ডিম কিনি। ওকে নিয়ে লিলি আমাকে ক্ষ্যাপায়। মাছওলা আছে। চাষিরা আসে। বেশ লাগে এদের। কলেজ জীবনে বা তারও আগে অনেক ভালো ছিলাম। বেশ একটা ব্যালেন্স ছিল। কখনো মনে হত না নিজে খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছি। পয়সা ছিল না তো কী হয়েছে? এগুলো অনেকেই অনুভব করে। নতুন কথা না হলেও বড় সত্যি।

জগদীশবাবুর কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে গেল বেলঘরিয়ায় কখনো যাইনি। আগে শুনতাম সাংঘাতিক জায়গা। খুনজখম লেগেই আছে। সেই সত্তর-একাত্তর। এখন চুপচাপ। আর পাঁচটা জায়গার মতোই। যে যাই বলুক একটা থিতোনো থিতোনো ভাব কিন্তু সব জায়গায়। গেলেই তো পারি একদিন। একা একা। ট্রেনে চড়ে। উলটোডাঙা মানে বিধাননগর, দমদম পেরোলেই বেলঘরিয়া। সেখানে অনেক অসংখ্য অজানা লোকের মধ্যে জগদীশ পালও থাকে যার ভাগ্য ফিরে গেছে। কফিটা খেতে ভালো লাগছে।

সিগারেট জ্বালিয়ে গাড়ির দরজা হাট করে খুলে হঠাৎ মন চলে গেল জগীদশবাবুর ছেলেকে ঘিরেই ফুটবলে। খেলাটা ভালো লাগত। এখন বড় ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়েই। অত ভালো টিম নিয়ে রাশিয়ানগুলো কেমন ধেড়িয়ে গেল ইউরোপিয়ান কাপের ফাইনালে। গোলে দাসায়েভ। ভাবা যায়? জগদীশবাবুর ভাগ্য ফিরে যাওয়ার সিক্রেটটা রাশিয়ানরা পেয়ে গেলে রুড গুলিট আর ভ্যান বাস্টেন গোল করতে পারত? রাশিয়াতে যে গ্লানসস্ত আর পেরেসত্রোইকা হচ্ছে তা কি জগদীশবাবু

জানে? ইস্টবেঙ্গল আবার একটা ফরেনের প্লেয়ার আনবে। জগদীশবাবুর ছেলে দুঃসাহসী গোলকিপার। ঘুম পাচ্ছে। কাল অনিল রাত জাগবে। ও আমাদের টাইপিস্ট। খুব ভালো ছেলে। রবিবার রাতে থাকবে অনিল। হাসপাতাল এখানে থাকবে। রোজ থাকে। আমি বাড়িতে থাকব। আমি কখনো হাসপাতালে থাকিনি। একবার, সেই ছোটবেলায় টনসিল অপারেশন হয়েছিল মেডিকাল কলেজে। আইসক্রিম খেতে বলেছিল ডাক্তার। বৃষ্টিটা বাড়ছে। গাড়িরও তো ঘুম পায়। অবশ্যই আমার স্ত্রী ও মেয়ে এখন ঘুমোচ্ছে। সাততলার ফ্ল্যাটে আজকে বোধহয় কোনো ডাকাত বা ম্যানিয়াক মার্ডারার আসবে না। হঠাৎ মনে হল যে মাঠগুলোকে ঘিরে হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে, যে মাঠগুলোকে আগে রেডিও শোনাত, এখন টিভি দেখায়—তারাও এখন ঘুমোচ্ছে আর ভিজছে। স্টিয়ারিঙের ওপরে মাথা রাখি। হাত অভ্যাসবশত গিয়ারে। তারপর নেমে পায়ের ওপর। ঘুম পাচ্ছে। গাড়ি চলছে। চলছে না। রাতজাগা শেষ হয়ে গেল। আমি বাড়ি ফিরছি। লিফট উঠছে। হাসপাতালের মেন বিল্ডিঙের মধ্যে কিরকম ম্যাটমেটে হলদে আলোগুলো জ্বলে। নাকি আলোগুলো সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ির মধ্যে উজ্জ্বল হতে পারে না। তাকালেই কিরকম ভয় ভয় করে। ওখান থেকে কেউ যে বেঁচে ফিরতে পারে বিশ্বাস করাই কঠিন। আটচল্লিশ ঘণ্টা টাইম বলেছে লাগবে অথচ লোকটার মধ্যে কোনো ভয় নেই। সঞ্জীবকে নিয়ে কিন্তু আমার ভয় আছে। হার্টের ব্যাপারে দেখেছি সামলে ওঠার মুখে অনেক সময় আবার অ্যাটাক হয়। আমার দাদারই হয়েছিল।

বৃষ্টিটা জোরে এল। দরজা বন্ধ করে কাচ কিছুটা তুলে দিলাম। গাড়ির ওপরে বৃষ্টির শব্দ। একটা বিচ্ছিন্ন অস্পষ্ট অবস্থায় গ্রেপ্তার বলে নিজেকে মনে হল। আটকা পড়ে গেছি। আবার ঢুলুনি আসছিল। চটকা ভাঙল কাচের ওপর আঙুল বাজানোর আলতো ধাক্কায়—

—'সার···ঘুমোচ্ছেন সার?'

বিদ্যুৎ চমকাল। লোকটা ভিজছে।

—'না, না, এই তো। ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন।'

—'আসব?'

—'হ্যাঁ—বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবেন?'

বলতে বলতে দরজা খুলে দিই। একবার ওয়াইপার চালাই। সামনে কেউ নেই। জগদীশ পাল গাড়িতে উঠে বসে। বেশ ভিজে গেছে। রুমাল বের করে মাথাটা মুছে নেয়।

—'নিন। একটা সিগারেট ধরান। ভিজে গেছেন।'

—'একটা তো খেলাম সার। দামি সিগারেট তো···বার বার খেতে কেমন···'

—'ছাড়ুন তো। নিন। ঠাণ্ডার বাজার। জম্পেশ করে ধরান। ধরিয়ে বলুন—ওই যে—বাই দ্য ওয়ে ছেলের খবর কিছু পেলেন নাকি?'

—'না, ডাকেনি তো। ডাক্তাররা কি হেমারেজ টেমারেজ বলছিল, মানে সেটা নটা নাগাদ···তবে বলেচে আমাকে ভয়ের কিছু নেই। ও নিয়ে ভাবচি না। আর খারাপ কিছু আর আমার হতে পারবে না বুঝলেন···ও রাস্তা মেরে দিয়েচি।'

সিগারেটটা ধরিয়ে জগদীশবাবু কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর বলতে শুরু করলেন কাশতে কাশতে,

—'একটু কড়া তামাক তো। ঠক্ করে লাগে। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে আচি, বুঝলেন? আগে সুইডেনের সায়েবদের ছিল। এখন মেড়োরা হাতিয়েচে। আমাদের ড্রাইভার মুখুজ্জে একদিন আমাকে বলল যে এসব হাত দেখানো আর পাথর পরে-টরে কিছু হবে না। ওসব ফালতু। কোনো জায়গায় তো আর দেখাতে বাদ রাখিনি। বেহালায় যে ফিল্ম আর্টিস্টদের হাত দেখে সেখান থেকে শুরু করে সব। মুখুজ্জে বলে সব ভুয়ো, সব ঢপ। গলায় দড়ির টুকরো জোগাড় করতে হবে।

—'গলায় দড়ি?'

—'হ্যাঁ। ধরুন কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে। সেই দড়ির একটু টুকরো যদি জোগাড় করে সঙ্গে রাখতে পারেন তো ভীম—যা চাইবেন তাই। যত আপনার ওপর কুদিষ্টি আচে, তুক হোক, তাক হোক সব শালা চৌপাট। খোকার এমন চোট। ভয় দেখেচেন আমার মধ্যে?'

—'পেলেন কোত্থেকে? শুনলেই তো মশাই কেমন অস্বস্তি হয়।'

—'আমারই কি হয়নি? প্রথমে তো ঘাবড়ে গেলুম। তখন মুখুজ্জেকেই বললুম জোগাড় করতে। ও বলল তা হয় না। নিজের জিনিশ নিজেকেই জোগাড় করতে হয় ঘুরেফিরে। তবে রেজাল্ট দেবে। জেলে গিয়ে বুঝলেন বেইজ্জৎ। সে হাসাহাসির ব্যাপার—বলে ঝোলানো নাকি বন্ধ হয়ে গেচে। এমনকী ঝোলানোর লোকই নাকি মেলা ভার। তারপর টালিগঞ্জ থানায় আমার এক বন্ধু আচে—কনস্টেবল—ওই জোগাড় করে দিল। ওই যে আপনার লেক পেরিয়ে লেক গার্ডেন হয়েচে না—ওইখানে একটা বড় লোকের বাড়ির ঝি আত্মঘাতী হয়েছিল। কেচ্ছার কেস। বুঝতেই পারছেন। সেই দড়ির টুকরো শুনলাম নাকি হেভি ডিমান্ড। বড় বড় সব লোক হন্যে হয়ে যায়। দেখবেন?

এবার আমি কেমন নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম না। থাকগে। দেখব না।

—ভয় পাচ্চেন? দেখুন না, ভালো মনে দেখলে ভয়ের কী আচে? কিচ্ছু হবে না আপনার। আমি বলচি।

পকেট থেকে বের করল। মাদার ডেয়ারির প্যাকেটে মোড়ানো। ভাঁজ খুলে বেরোল কালচে হয়ে যাওয়া মাঝারি মাপের এক টুকরো নাইলনের দড়ি। দুটো দিকই কিছু দিয়ে ঘষে ঘষে কাটা বলে এবড়োখেবড়ো। বোধহয় একসময় নীল রঙের ছিল।

—'দেখলেন তো! এই হল আসল ব্যাপার। তবে ঝামেলাটা কোথায় জানেন তো। দড়ি কাছে থাকলে কক্ষনো একলাটি থাকতে নেই। ফাঁকায় পেলেই সে এসে "দড়ি দে, দড়ি দে" বলে চাইবে। দেখচেন না কেমন ভয় ঢুকে গেচে আমার মধ্যে। একদম একলা থাকতে পারি না। আপনার কাছে রয়েচি···ফাইন। ছেড়ে গেলেই রাজ্যের ভয় জাঁকড়ে ধরবে। ভাবুন তো—জিভ বের করা ঘাড়ভাঙা সেই যদি এসে "দড়ি দে, দড়ি দে" বলে কার বুক কাঁপবে না!

—'এটা পেয়ে থেকে আপনার ভাগ্য খুলে গেল?'

—'আস্তে আস্তে হচ্চে। সবুর করতে হবে। অপঘাতের উলটো ফল তো। আস্তে আস্তে ফলে। এরা মরার পরে বুঝলেন খুব অনুগামী হয়। ভালো করতে চায় লোকের। পাপ করেচে তো। মহাপাপ। এবার চুটিয়ে ভালো করে লোকের। কেউ কাঁচা জল খাচ্চে তো দিল একটু চিনি মিশিয়ে।'

—'কিচ্ছু বোঝেননি? মানে ভাগ্য ফিরে যাওয়া।'

—সে তো বুঝেচি। আপিসে ঝুটঝামালা ছিল। পাওনাগণ্ডার ঝামালা। অল্প অল্প

মিটচে। বউয়ের শরীরটা অনেকটা সেরেচে। যা কষ্ট পেত অম্বলের—চোখে দেখা যেত না। আমার নিজের একটা ঘাড়ের ব্যথা ছিল। কমছে। আমাদের ঘরে, বুঝলেন বেড়া কেটে ইঁদুর ঢুকত। কমে গেল। ছেলেটার নাম বেরোল খবরের কাগজে। তবে কি জানেন—ভাবতে নেই। ছেড়ে দিতে হয়। বেশি চাইতে নেই। এই যে আপনার সার গাড়ি, বলুন, বুকে হাত দিয়ে—চেয়েছিলেন হাঁ করে? চাইতে হয় না। যখন হবার গাড়ি, ধন, ইজ্জৎ দেখবেন পর পর গজাতে থাকবে।'

কার যেন নম্বর ডাকচে। আওয়াজটা অস্পষ্ট। বৃষ্টির শব্দও তো ছিল।

—'নম্বর ডাকচে কার!'

—'ডাকচে। ডানকানটা বড় ভোগায় আমায়। যাই। খোকার নম্বর—সার বাহান্ন বলেচে?'

—'স্পষ্ট শুনতে পাইনি। এবার সার একাই যাব। বিষ্টি পড়চে। আপনি দেখুন। ঠিক চলে যাব।'

গাড়ি থেকে নেমে জগদীশ পাল ছুটতে থাকে। তারপর কাদায় পা হড়কে পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি যেয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাত ধরে তুলি। হাঁটুতে চোট লেগেছে।

—'ভাবলাম আপনাকে ছাড়াই পারব। এমন কাদা হয়ে রয়েচে।'

—'চলুন। দেখুন আগে কত নম্বর ডাকল?'

ওখানে যেয়ে দেখি সাতাশ নম্বর ডেকেছে। তাদের লোক কে বোঝা গেল না। কারণ কেউ সাড়া দিল না। জগদীশ পাল বসে হাঁটুতে হাত বোলায়।

—'ব্যথা লেগেছে বেশি?'

—'না সার। তবে বয়েস হচ্ছে তো। অল্প চোট লাগলেই মাথা ঝিম ঝিম করে।'

—'আপনি এবার বরং একটু শুয়ে থাকুন।'

—'হ্যাঁ, এবার শুই। আর ডাকবে না বোধহয়। খোকা তো সামলেই গেচে।'

—'না, না, ডাকবে কেন? আপনি ঘুমোন। আমি গাড়িতে যেয়ে বসি। কোনো ওষুধ-টষুধ চাইলে বলবেন। নিয়ে আসা যাবে।'

—'আচ্ছা সার আপনি···'

জগদীশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ভাবলাম—আছাড় খেতে আবার পকেট থেকে পড়ে গেল কিনা।'

আমি গাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। ভোর হয়েছিল। সকালে চলে আসার সময় দেখলাম হাঁটু চেপে ধরে জগদীশ পাল কুঁকড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ওই পকেটটা চেপে শুয়ে।

পরদিন রবিবার অনিল রাত জেগেছিল। দড়ির কথাটা লিলিকে বলব কি বলব না করতে করতে আর বলিনি। ওর একটু আবার নার্ভের প্রবলেম আছে। সোমবার অফিসে অনিল বলল ওরকম চেহারার কোনো লোক ওর চোখে পড়েনি। বেয়ারা একটু পরেই খবর দিল যে ফুটবলের চোট যে ছেলেটার ছিল সে রবিবার সকালেই সাতটা নাগাদ মারা যায়।

১৯৮৮

হাওয়া হাওয়া

"ঐকতান বাদ্য নীরব হইল; পরিশ্রান্ত নর্তক-নর্তকীগণ বিশ্রামের জন্য কৃত্রিম লতাকুঞ্জের অন্তরালে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ; দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অশান্তির ছায়া কাহারো মুখে নাই; সকলেই যেন আনন্দসাগরে ভাসিতেছে।" —'লেডি ডাক্তারের লেড়কা'
—দীনেন্দ্রকুমার রায়

রতনে রতন চেনে, আমি চিনি পুলিশের কিলার। ফোলা ফোলা মুণ্ডু, তেল চুকচুকে চুল, আলতো মোঙ্গোলিয়ান মুখে ঘোলাটে দুটো চোখ, নোংরা টেরিলিনের বুশশার্ট, বেঢপ খ্যাজাব্যাজা কালো প্যান্ট, তাতে ঘাম শুকোনো শাদা নোনা দাগ—তোমাকে দেখে ঠিক চিনেছি ভায়া। কোথাও একটা মাইকেল জ্যাকসনের লাইব্রেরিয়ান গার্ল বাজছে। বেশ প্রেমনগর-প্রেমনগর ভাব। আমার হিরোহন্ডা নজর তো ভুল করে না। ঠিক চিনেছি। এখন আর খুনজখমের লাইনে নেই। মানে দেদারে নিয়মমাফিক রাষ্ট্রের কোটায় মার্ডার কম হচ্ছে। ওদিকে বস্‌রাও বোঝে। বয়স হচ্ছে। মোটের ওপর থোবড় আর আড়া-তে বেশি পালটায়ওনি। আর যতটা বদল হয়েছে ততটা তো আমারও হয়েছে। ভিআইপি ঠেকনায় নজর রাখছ। আমিও এসেছি বাবা একই গলতায়। আপাতত তুমি আর আমি কাঁঠালপাড়ায় দু-খানি মুগ্ধ গুয়ে মাছি। ধান্দা এক।

তবে কিলার, এখন তুমি আর আমার মধ্যে অনেক অনেক ডেডবডি ফারাক। এখন আমি অ্যামেচার বিপ্লবী নয়, পুরোদস্তুর রিপোর্টার। পকেটে প্রেস কার্ড খোঁচাচ্ছে। তোমার কোমরে খোঁচাচ্ছে পিস্তল। সত্তরের দশকের গোড়া নয়। এটা আশির দশকের শেষ। কিং অফ গজল যে হোটেলে উঠেছে সেখানে ঘটনার চক্কোরে আমরা দুজনেই ফিট। তুমি এসেছ সিকিউরিটি মারাতে। আমি এসেছি গজল কিং-এর কাছে রাতচরতে জনৈকা চিত্রতারকা এসেছে না আসেনি, এসেছে না আসেনি—আসেনি এখনো। হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া হাওয়া।

আমার যিনি এডিটর তিনি এয়ারকন্ডিশনশ্ ঘরে বসে নিজের বগলে থেকে থেকে আঙুল চালিয়ে গন্ধ শুঁকে অনাবিল আনন্দ পান, সেই সঙ্গে ইমপোর্টেড সিগারেট টানেন,

এই তড়পান এই গলে যান এবং তাঁর স্থায়ী নির্দেশ হচ্ছে সবসময় গন্ধের জন্য চোখকান খোলা রাখবে, নাক লাগিয়ে দেখবে কোথায় কে কাকে কাঠি করল, কোথায় কোন কাঠি সরেস হল। লোকের জ্ঞান মারাবার সময় নেই। বাঁ হাতে ছোঁচাচ্ছে, ডান হাতে ভাত খাচ্ছে—কুইকি বা জলদি পেড়ে ফেলার যুগ। জয় হোক স্ট্রেস ও টেনশনের। মশলা দ্যাখো—খুঁজে বের কর, লটকে দাও। খেলা জমে যাবে। সে মতোই এই ডিউটিতে যখন হাজির তখন স্মৃতির-ব্যাবিলন থেকে সহাস্য খোঁচড় এগিয়ে আসে হোটেলের সামনে ঝুল-বারান্দার তলায় যেখানে আলোয়, লোকে, উকুনে, গণিকায় ম ম করছে রাত ৯-টার আমিষ মেজাজ। খোঁচোড়শ্রী, জোর হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া হাওয়া। এক, দো, তিন, চার-পাঁচ-ছয়—এতক্ষণ গাড়ি গুনছিলাম। টু হুইলার বাদ দিয়ে দিয়ে। মাগীটা আসবে ঠিকই। দুটো দোকান পরে দাঁড়িয়ে আছে জিনসের জ্যাকেট পরা আমাদের ফোটোগ্রাফার যার নাম ইঁদুর। ও ট্যাবলেট খায়। সবসময় ঝিমমারা ভাব। কিন্তু ছবিটা দারুণ তোলে। মারুতি ফিয়াট মারুতি মারুতি জিপসি অ্যাম্বি মারুতি খোঁচড়কিলার—

ওকে দেখেই চিনে ফেলেছি এবং হেভি রং মেরে সিগারেট দাঁতে কামড়ে কিছুক্ষণ ওকে দেখি যেন ধরিয়ে নিয়েই ক্লিন্ট ইস্টউডের মতো ধুমা ক্যালাব। ও এগিয়ে আসতে সিগারেটটা জ্বালাই। নিয়নে ধোঁয়া ছাড়ি। ছোপ ধরা দাঁত মেলল ও। গাড়ির জেরবার করে দেওয়া আওয়াজ। গ্লাসনস্ত্, অর্থাৎ খোলামেলা পরিস্থিতি। খুলেছি। এবারে মেলব। ওই কথা বলে।

—চিনতে পেরেছি তাহলে। শরীরটা কিন্তু বলব, খারাপ দেখচি না।

—কোথায় দেখেছি বলুন তো—আমারও চেনা চেনা লাগছে।

—ঠেকবে না? দু-দুটো দিন আপনাকে যা ফলো করেছিলাম দীঘাতে। মনে পড়চে?

—একটু একটু।

—সে কি আজকের কতা। ব্যাপারটা কী ছিল বলুন তো। আপনাকে স্রেফ ঝেড়েই দিতাম।

—মানে?

—খতম করে দিতাম। করব ভেবেওছিলাম।

—তারপর?

—তারপর দেখলুম মাতাল, মানে আপনি তখন আরো ইয়ংম্যান—স্রেফ মাতাল। পলিটিক্যাল মুরগি নয়। লাভকেসের মাল। ও আমরা বুঝি। যা হোক, খুব বাঁচা বেঁচে গেছেন সেবার। তা এখন কী করেন?

—রিপোর্টার। খবর নিই।

—কোন পেপার?

নাম বললাম। শুনে খুশিতে একেবারে ডগোমগো।

—খেলার পাতাটা আপনাদের সলিড হয়। ওই যে, রেফারি প্যাঁদানোর কেচ্ছা—

—হ্যাঁ, আমাদের স্পোর্টস পেজ-এর জন্যেই অনেক লোক পড়ে।

—বলচি কী। এইসব খেলাটেলাই ভালো। ওসব পলিটিক্স-ফলিটিক্স তো অনেক হল।

—যা বলেচেন।

একটা একটা করে দোকান বন্ধ হচ্ছে। কিউরিও-র দোকান বন্ধ হল। থামের গায়ে গা ঘষছে সস্তার পাউডার, উপচোনো নাইলনের শাড়ি পরা মেয়ে। ট্যাক্সিতে উঠে গেল।

বিরাট ভালগার জাম্বো বেলুন নিয়ে একটি সুখী পরিবার চলে গেল। রাত হয়েছে কিন্তু বাচ্চাগুলো বেশ তরতাজা। সেই কিউরিওর দোকানে সিঁড়িতে আমরা সেঁটে যাই।

—মাগীগুলোর পারনাইট ইনকাম মন্দ না।

—না, মন্দ হতে যাবে কেন?

—বাজারে হাল দেখেচেন? বাজি পুড়চে। বেগুনের দর শুনে পটোল দাঁত কেলিয়ে হাসচে। অথচ এই চামড়ার বাজার দেখুন—কোনো হেরফের নেই।

দুনম্বরি ইনকামে বোধহয় মন্দা চলছে বলে মনে হল।

—এখনো ওরকম মাল খান। দুদিন যা টানতে দেখেছিলুম—সকাল-সন্ধে ভড়ভড় করছে গন্দ।

—খাই না নয়। তবে ওই ন-মাসে ছ-মাসে।

—সেই ভালো। ভালো থাকুন, সব ভালো। ঘরসংসার করেচেন?

—করেছি।

—বাঃ ভুবন তো, সেদিন যদি নকশালদের দলে ভেড়ার জন্যে ঝাউ জঙ্গলে ঝেড়ে দিতুম—গরম মাল ছিল পকেটে—লোড মাল—কারো বাপ ছিল না কিছু বলে।

—ভাগ্যে ঝেড়ে দ্যাননি।

—মাইরি বলচি। মা কালীর দিব্যি। আপনার সঙ্গে গেলুম—রিপোর্ট ছিল—তারপর দেখলুম মারলেও মরবে না মারলেও মরবে—সুইসাইড কেস।

—কে আবার সুইসাইড করল?

—না মানে আপনার মতো ছেলেরাই তো কলেজে ফলেজে আকছার ছুঁড়ি ধরে। তারপর আজকালকার যা সব মেয়ে। পাল্‌টি খেল তো আপনারাও ঘপাঘপ সুইসাইড করলেন—কত দেখলুম।

—কী করে জানলেন এত কথা বলুন তো।

—আরে বাবা আমরা হলাম পুলিশের বাচ্চা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এত দেখেচি যে ট্যারা চোখে তাকাব সব এক্স-রে হয়ে যাবে। বলুন, লাভ কেস ছিল না?

—ছিল।

—সুইসাইড করতে যাননি?

—গিয়েছিলাম।

—শেষমেশ ভয় খেয়ে গেলেন।

—একদম।

—হয়। সব সুইসাইড কেস একবার ভাবে। মানে, ভাবে কি আর? ভাবায়। তখন ভূতের টান ভালো থাকলে সামলে যায়; না থাকলে ফৌৎ।

—ভুতের টান!

—আরে বাপ ঠাকুদ্দার ভুত তো সবসময় চোখে চোখে রাখে না! ধরুন আপনার মা মরেচে। হেভি স্ট্রং সেই টান। ডানদিক বাঁদিক কড়া নজর রাখবে। একদম বেচাল করতে দেবে না।

—আমারও ওপর টান ছিল বলছেন?

—টান না থাকলে ফিরতেন? ওরকম জগঝম্প সমুদ্দুর, লাভ কেস, পদ্যের বই, বাঁশি, মালের বোতল, চাঁদোয়া রাত—কেউ ফেরে? টান, টান—কতরকম ভুত, তারপর প্রেত, আত্মা—এসব কি ভেবেচেন ফ্যালনা? একটা বই রয়েচে। তাতে সব আচে।

—কি আছে?

—সব আচে। ওই আপনার ভালো লোক ধরুন, ঠিক মোহান্ত বা সাধু বলচি না, তেনারা আরো হায়ার লেভেল—ধরুন এই আপনার বা আমার মতো সাতে পাঁচে মারায় না তারা মরলে মোটামুটি পঁচিশ হাজার, টুয়েন্টি-ফাইভ থাউজ্যান্ড কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে।

—বলেন কী?

—আর যারা আপনার অপঘাতে মরেচে—বাস চাপা, গায়ে আগুন, গলায় দড়ি, ফলিডল—

—আর আপনি যাদের মেরেচেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারাও, হাজার হলেও অপঘাত তো—এরা সব থাকবে ড্যাঙা ছুঁয়ে ছুঁয়ে—তারপর এই গত্ত দেখল, ডাবের খোলা দেখল—ব্যাস্, পুঁক করে সেঁদিয়ে গেল, তারপর আপনার আঁস্তাকুড়ে, আঁদাড় পাঁদাড়—নন্দমা, কোটর যা কিছু দেখবেন অপঘাতে মরা জানবেন বিজবিজ করচে।

—করছে তো বুঝলাম। ওরা আর কিছু করে না? ধরুন আপনি যাদের মেরেছেন?

—করবে না আবার? সারাক্ষণ ওই তালেই তো রয়েচে। পেলেই সাবড়ে দেবে। তবে আমাকে কিছু করতে পারবে না।

—কেন?

—আচে। একটা জিনিশ আচে।

—কোথায়?

—এই ধরুন, আমার গায়েই আচে। তবে দ্যাখানো বারণ। আপনি বলে বললাম। অনেককেই বলি না।

—ব্যাপারটা দারুণ তো!

—দারুণ বলে দারুণ। আরো বলচি। ধরুন টান আলগা। বাপ মা মরেচে অনেক আগে। উঠে গেচে ওপরে। পাত্তা দিচ্ছে না। তখন কী করে নিজেকে ঠিক রাখবেন? ফিট থাকবেন কী করে?

—ফিট থাকবই না।

—বয়েসে অনেক ছোট আচেন, তাই বলচি। লজ্জা পাবেন না। তখন হল সেক্স, রেগুলার ধোলাই। এখনো যদি আপনাকে একটা টিক্ দিই ফ্ল্যাট হয়ে যাবেন।

—তা তো বটেই। যা বডি-টা রেখেছেন।

—রাখতে হয়েচে ভায়া। পুলিশের ডিউটির জানবেন মা বাপ নেই। ঠিক না রাখলে চলবে? এই, কালী, কালী, এ হল প্রায় তন্ত্রসাধনা। যা খাবেন হজম হবে। শরীর চনমন করবে। মিলিয়ে নেবেন।

—নেব।

—তান্ত্রিক, তারপর আপনার গিয়ে ওই কাপালিক—এদের দেখবেন বডি। সেই ইন্দিরা গান্ধীকে যখন পোড়াল, টিভি-তে দেখিয়েছিল সব, দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—মনে আছে ধীরেন ব্রহ্মচারীকে? ইয়া বুকের পাটা। ওই ঠাণ্ডা, দিল্লিতে লোকে ওভারকোট সব পরে—তখন উদোম খালি গায়ে—বাপরে বাপ···

খড়্গপুর স্টেশনে রাতের প্ল্যাটফর্মের দুপাশে সিআরপি দাঁড়িয়ে যেন আমাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছিল। যদিও পরেছিলাম, তখনো এত জিনস্-এর চল হয়নি। আমার কাঁধে একটা কিটব্যাগ ছিল। এগরা, বেলদা না সাতমাইল—ভুলে গেছি এরকম কোনো জায়গা ছাড়ার পর দেখেছিলাম মাঠের মধ্যে আলপথ ধরে ভোরবেলা চলেছে রাইফেল কাঁধে খাকির দল। সেবার সাইক্লোন হয়েছিল। খোঁচড়সাহেব বোধহয় খড়্গপুর থেকেই পিছু নিয়েছিলেন। বাসে একবার গান গেয়ে উঠেছিলাম, মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো। সেই সূত্রেই হাওড়ার মিহিদাদা ও দানাদার বউদির সঙ্গে আলাপ। কি হুড়কালাম কাণ্ড। বউদি যে ভাড়া করা সে কি আমি বুঝিনি? মিহিদাদার বগলে ব্যাগাটেলি, কোঁচড়ে আলুর দম। সেই বউদি কি আমাকে চিপ ক্যান্টিনের দোতলায় ছোট্ট আস্ত ইলিশ ভাজা খাওয়ায়নি? গান শোনায়নি? এবং বিনিময়ে আমিও কি মাউথঅর্গ্যান বাজাইনি যা এই পুলিশের বাচ্চা শুনেছিল? পুলিশের নির্দিষ্ট এই খুনেটির ভার্সানে তখন আমার হাই রোমান্টিক ফেজ। মারিও প্রাজ-এর বই ছিল সঙ্গে। আরো ছিল—অডেনের সমগ্র কবিতা—প্রায়ান্ধকার রেস্তোরাঁ যেখানে প্রেমিক প্রেমিকারা পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। করা যখন হল না তখন মরেঙ্গে। হাওয়া হাওয়া। এস হে সমুদ্রের ঢেউ। ফণা মেলে এসো। নিয়ে যাও আমাকে। সমুদ্রের গভীরে, গভীরতম গভীরে, যেখানে আলো আসে না, সেখানে স্নায়বিক দৃষ্টি মেলে শিরশির করে চক্ষুহীন স্বচ্ছ চিংড়ি মাছ, আশ্চর্য এনিমোন, ফোরামিনিফেরা অথচ সেখানেও যে ঝিনুক পাওয়া যায় তার গায়ে আজব আজব সব রং, কেউ নেই যে সেসব রং বানায়, ধাঁধা, যার সমাধান করা যায় না, এ আমার আশ্চর্য জগৎ যদিও পুলিশের খুনে খোঁচড়ের জগৎও কিছু কম বিচিত্র নয়। ওদিকে সেই ফিল্মস্টার, নচ্ছার মেয়েমানুষ তো এখনো এল না গজল সম্রাটের কাছে। আরো রাত থাকতে হবে। ট্যাক্সি অবশ্য পাব। এত হাওয়া গরম হাওয়া এই থার্মোশহরের—পুলিশের কিলার—আমি তাকে সিগারেট দিই—

—ঘুষ?

—বলতে পারেন। এখানে কেন এসেছি বলুন তো?

—কী আবার, ওই খানকি মাগীর কেচ্ছা ঘাঁটতে।

—কী করে জানলেন?

—রিপোর্টার। আপনাদের উচিৎ ধরে ধরে নেহরু বাল মিউজিয়ামে পাঠানো আর পুলিশের দরকার একটা খবরের কাগজ ছাপা।

—যা বলেছেন দাদা।

—আমাদের আবার এই ছামগুলোর ওপরে নজর রাখতে হয়।

—কেন?

—বাঃ ঝপ করে যদি কিডন্যাপ হয়ে যায়। দেখলেন না, সেদিন রেখাকে তুলে নিয়ে যাবার ধান্দা করেছিল। ওঃ কি ফুরফুরে হাওয়া ছাড়চে দেখেচেন—গঙ্গার।

—হ্যাঁ। আপনি মাইরি কিন্তু পুরো চমকে দিয়েছেন আমায়।

—কেন?

—ওই যে বললেন বার বার। ঝেড়ে দিতাম।

—দিতাম তো। কোনো বেগড়বাঁই দেখলেই—কত ঝেড়েচি তখন—তবে হ্যাঁ, অর্ডার পেলে। নিজেরও তো বালবাচ্চা আচে, মারতে কারো ভালো লাগে?

—মনে পড়ে?

—পড়বে না? তবে আর বোধহয় ওরকম পারব না। মশাই, দাঁড় করিয়ে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোকে গুলি করেচি। এমনভাবে মেরেচি যে ভাবলে এখনো গা গোলায়।

—কেমন লাগত মারতে?

—তখন তো ভাবা নেই। স্রেফ ঝাড়ো। জানে গুলি খাবে, তখনো দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে স্লোগান দিচ্চে। আশপাশের বাড়ির লোক দরজা জানলা বন্ধ করে রয়েচে। সিঁটিয়ে। বেলেঘাটায়।

—বরানগরের কিলিং-এ ছিলেন না?

—না ভাই। ওটাতে ডাক পড়েনি।

—আর?

—ওই যে আপনার কি যেন সিনেমাটা—সাউথে—ওর পেছনে রাতের বেলায় নিয়ে গেলাম। ওদেরই পাড়ায়। দুটো ছেলে ছিল। বললাম যা—পা টিপে টিপে বাড়িতে যা, ছেড়ে দিলাম। তারপর পেছন থেকে—

—ওরা বুঝতে পারেনি?

—পারেনি? এ সবাই বোঝে। ওরাও জানত যে বাড়ি যাচ্চে না। আরে মেরে মেরে হাত পচে গেচে, বুঝলেন? হাত পচে গেচে। মেরেও সুখ হত না। পা দিয়ে নেড়ে দেখতাম তখনো ধুকপুকুনি আচে কিনা।

—তা আমাকেও দিলেন না কেন? সব তো রেডি ছিল।

—কেন? ওই যে বললুম—গিয়ে দেখলুম আপনার বিবাগী ভাব, তার মধ্যেই আবার ছুঁড়ি দেখলেই ছোঁক্ ছোঁক্ করচেন। সারাক্ষণ কী বিড়বিড় বকচেন। আপনার ব্যাগ হাতড়ে দেখলুম ইংরিজি পদ্যের বই। মালের বোতল। বাঁশি।

—বাঁশি বড্ড কেষ্ট-কেষ্ট লাগে। মাউথ অর্গ্যান বলুন।

—ওই হল। তারপর দেখলুম ঝাউ জঙ্গলে ঘুমোচ্চেন বই মাথায় দিয়ে। রাতে মুরগি যেমন ঘুমোয়। দয়া হল। মারলুম না।

একটু দূরে যদি ক্যামেরা বসানো থাকত তাহলে দেখা যেত আচমকা উঠে আমি ছুটছি। ইঁদুর ছুটছে ক্যামেরা নিয়ে। তখন আমরা অদম্য কারণ সেই ফিল্মস্টার আসছিল। সাউন্ড ট্র্যাকে আমার চিৎকার।

—কোথায় যাচ্ছেন? রুম নাম্বার ফাইভ থ্রি জিরো। হ্যালো, ও মিসেস!

ইঁদুরের ফ্ল্যাশ চমকায়। নিকন ধরছে নিয়নসুন্দরী। প্রোফাইল। তিনি আমার দিকে তাকান। অবশ্যই ক্রুদ্ধ।

—ওঃ অসহ্য। কী চান এখানে?

—এক্সকিউজ মি, আজ কি গজল কিং-এর সঙ্গে স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট? শুনলাম আপনারা বিয়ে করছেন।

—ইউ সোয়াইন, ও আমার বন্ধু।

—ইমরান খানও তো আপনার বন্ধু।

—ইয়েস, ইমি ইজ অলসো আ ফ্রেন্ড অফ মাইন!

ফিল্মস্টারের চামচা ও দারোয়ান আমাকে প্রায় সরিয়ে দেয়। চামচাদের বুঝলাম কিন্তু দারোয়ান! এটা অরিজিনাল থিসিস—দারোয়ানরা একটা নিউ ক্লাস। কত বছর ধরে বিপ্লবের সঙ্গে দহরম মহরম—গোরবাচভ, তিয়েনআনমেনের বাজারে একটা দুটো নতুন কথা না বললে কেউ পাত্তা দেবে? এডিটর সাহেব, হে সম্পাদক, তোমার চারশো

টাকা দামের নাইলনের গেঞ্জি, তোমার চেকনাই, হারামিপনা, বুদ্ধিবরাত—গুরু, তোমার কাকে ভালো লাগে? ওই ডবকা এবং এক্সপ্লোসিভ ফিল্মস্টারকে না এই আধা মোঙ্গোলিয়ান খুনে ও খোঁচড়টিকে?

সরি! হে বরেণ্য খুনে, একাধারে খুনে ও খোঁচড়। তুমি শালা ফ্লপ ফিল্মের ঢপবাজ ভিলেন। ইয়েস। মুখে তুমি মালের গন্ধ পেয়েছিলে ঠিকই। হ্যাঁ, আমি ঝাউবনে সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম অডেন সাহেবের সমগ্র কবিতা মাথায় দিয়ে। ইহাও সত্য যে তুমি বিরক্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিলে। ফিরে গিয়েছিলে কয়েকটা দারুণ খবর না জেনেই। আমার কাছেও কিন্তু হস্তান্তর করার জন্য একটি দুরন্ত বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র ছিল—ভারী, ছোট ও মোক্ষম। যেটিতে গুলি ভরা ছিল এবং তৎসহ ছিল কয়েকটি চিঠি ও বেশ কিছু টাকা। তুমি চিপ ক্যান্টিনে আমার কিটব্যাগ হাতড়ে এসব কিছুই পাওনি। এবং ইডিয়ট, তুমি শালা যখন বে-কাফেতে বসে অমলেটের অর্ডার দিচ্ছ তখন আমার চোখ খুলে গিয়েছিল ও আমার কাছে কয়েকজন লোক এসেছিল। তাদের যা দেবার ছিল আমি দিয়েছিলাম। যা নেবার ছিল নিয়েছিলাম। এর তুমি কিছুই বোঝোনি। তাছাড়া তোমার ওপরেও আমার নজর ছিল। একতরফাভাবে ব্যাপারটা ঘটার বদলে তোমাকে শালা আমি এইচএমভি-তে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। পুলিশের গান রেকর্ড করার জন্যে নয়। হঠাৎ মায়ের ভোগে।

অ্যাসাইনমেন্ট খতম। ইঁদুর ট্যাক্সি ট্যাক্সি বলে চেঁচাচ্ছে। পেয়ে যায়।

—চলি তাহলে।

—হ্যাঁ, খুব ভালো লাগল দেখা হয়ে। এই মাগীটা কখন বেরোবে বলুন তো।

—দাঁড়ান, সবে তো সন্ধে, আগে গানটান শুনুক।

—গান শুনবে, বসবে, তারপর আপনার—

—তন্ত্র সাধনা!

ছোপ ধরা দাঁত বেরিয়ে আবার সেই হাসি।

—চললাম দাদা।

—আসুন ভাই।

ট্যাক্সিতে উঠি। ইঁদুর ঘুমোবার ভান করছে। ড্রাইভারকে বলি গড়াতে। আর কখনো হয়তো খুনে ও খোঁচড়, যে দীঘাতে আমাকে দয়া করে মারেনি, তার সঙ্গে দেখা হবে না। সাইক্লোন মাথায় করে ফিরেছিলাম, হাওড়া স্টেশনে সেদিনই দুটো ছেলেকে গুলি করে পুলিশ বরফে শুইয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল বড় লিডার কাউকে মেরেছে, ওদেরই ঢপ দেওয়ার জন্যে একটা বড় বাহারি মাদুর কিনেছিলাম এবং গলায় ছিল ঝিনুকের মালা। হাত নাড়ি। জল্লাদও তার খুনে হাত ঝটপট করে নাড়ায়।

এভাবেই ধূমকেতুর সঙ্গে গ্রহের দেখা হয়ে যায়। সিনেমাতে হয়। জীবনেও হয়। হলদে ট্রাফিক লাইট ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। আলোর খেলা এই রাতের কলকাতায়। উজ্জ্বল ভিডিও গেম।

গানটা কিন্তু জব্বর গেয়েছে। হাওয়া হাওয়া। তেতে ওঠা থার্মোশহরের হাওয়া ট্যাক্সির জানলা দিয়ে তোড়ফোঁড় করে ঢুকছে—হাওয়া হাওয়া।

১৯৮৯

মরণদান

কোনো কোনো লোকের জীবন এমন একঘেয়ে কাটে যে ওই একঘেয়েমি মানতে মানতে তারা কখন যে মরে গেল সেটা বুঝতেও পারে না। ভাবলে মনে হয় মরার পরেও একটা ধন্দ থাকে তাদের। এদিক দিয়ে আমার মতো ভাগ্যবান লোক কম জন্মায়। যখনই থকে যাই আচমকা এমন একটা কিছু ঘটে যে আবার চাঙ্গা করে দেয়। কিন্তু এটা বেশি লোককে বলাও যায় না। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন ভাবে আমিও ওদেরই মতো ঘষটে ঘষটে টিকে আছি। ভাঁড়ের আধুলি। ব্রেনলেস কতকগুলো ভেড়া। অবশ্য ওরকম ভাবলেই ভালো। তা না হলে আবার হিংসে এসে পড়বে। ত্যাড়া নজরে তাকাবে। হিংসের সামনে আমি বড় থতমতো খাই। কু-নজরের ভয়ও আছে আমার। সু-কু নিয়েই যখন পৃথিবী।

আমার প্রথম ব্যাপারটা হল কিছুদিন পরপর পাগলদের সঙ্গে আশ্চর্য যোগাযোগ। চান্স, দৈব, এটা হয়েই যায়। একটা আধটা খুচরো উদাহরণ দিলে বোঝাতে সুবিধে হবে অথচ সেগুলো বললে বিজনেসের দিক থেকে কোনো প্রবলেমও হবে না। তবে মহিলা সাইকিয়াট্রিস্ট, যাঁর কাছে আমার স্ত্রী আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে না বললেই ভালো। ওষুধ পালটে দেয় যদি।

এই তো সেদিনই একটা লোক—চিমসে, মরকুট্টে, ফ্যাতাড়ুর মতো দেখতে—আমাকে ধরেছিল। তার কাছে দুর্দান্ত দুটো স্কিম আছে। সারা দুনিয়ার লিডারদের কাছে সে স্কিমদুটো পাঠিয়েছে। এখন অবধি দুজনের জবাব এসেছে। খুব তারিফ করেছে তারা—মার্গারেট থ্যাচার আর গরবাচেভ। দুজনের সঙ্গেই ওর কথাবার্তা হবে। সামনের মাসে ফ্লাই করছে। বসে গেলাম শুনতে তার স্কিম।

এক নম্বর হল আজকাল যে মালটিস্টোরিড হাইরাইজ বাড়ি হয় তার বারান্দার বাইরে ও একটা বাইরের দিকে বেরোনো প্রোজেকশান বানাবে। অনেকটা সাঁতারের ডাইভিং বোর্ডের মতো। দু-একটা এখন ও পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করবে। পরে স্কিমটা সরকার সোৎসাহে মেনে নিলে ওটা বাড়ির প্ল্যানের মধ্যেই থাকবে। আলাদা করে বানাতে হবে

না।

খুব উঁচুতে এরকম একটা দাঁড়াবার বা বসার জায়গা নাকি আজকের মানুষের পক্ষে খুব জরুরি। কোনো রেলিং থাকবে না, খুব বড়ও হবে না। ওটা যারা একা থাকতে চায় তাদের জন্যে। মানুষকে আজ অসংখ্য জিনিশ তাড়া করেছে। চিফ মিনিস্টার, সায়েন্টিস্ট, প্রধানমন্ত্রী সবাই তাড়া করেছিল তাকে। পুলিশ কমিশনারও ছিল। সেইসঙ্গে এস-বি, সি-আই-ডি, 'র'। তখনই প্ল্যানটা তার মাথায় খেলেছিল। একফালি জায়গা—বাইরে। ব্যক্তিগতভাবে বললে ব্যাপারটা আমারও মনে ধরেছে। হতেই পারে। তবে পৈতৃক একতলা বাড়িতে থাকি বলে বেশি আর ভাবিনি। ওর দ্বিতীয় স্কিমটা ঠিক পরিকল্পনা নয়—এটা একটা প্রস্তাব যা অ্যাডভেঞ্চারাস প্রোপোজাল বলা চলে এবং প্রথম স্কিমটির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ও উড়ন্ত প্লেনের ডানার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, হাঁটতেও পারে। এটা ও হাতেনাতে করে দেখাতে চায়। আজকের যুবসমাজ এটা দেখলে সাহস ফিরে পাবে। তরুণের জন্য স্বপ্ন চাই, না হলেই ড্রাগ, সিনেমা, এইডস। এয়ারফোর্সের প্লেনে ও এটা করতে চায়। প্রত্যেকটা ব্যাপার বিশদভাবে কাগজে লেখা। ছবিও আঁকা আছে। তারপর পাতলা প্লাস্টিকের খামে জড়ানো। এগুলো একটা দড়িবাঁধা পোর্টফোলিওর মধ্যে থাকে। ও জানতে চেয়েছিল দ্বিতীয় ব্যাপারটায় আমি তাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি কিনা। মানে এয়ার মার্শাল কেউ জানাশোনা আছে কিনা। যখন শুনল পারি না তখন বলল নিদেনপক্ষে চা সিগারেট খাওয়াতে। খাওয়ালাম।

এরকম অনেক চেহারার, অনেক স্বভাবের পাগল আমি দেখেছি। এমন লোক দেখেছি যারা স্রেফ বেমক্কা শোক পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। সুইসাইডও কম দেখিনি। সুইসাইডের আগে কারো কারো মধ্যে আধাপাগল বিবাগীভাব আসে। সেও দেখেছি। অবশ্য একটা নয়, দুটো কেস দেখেছি যেখানে পাগলামির কোনো ছিটেফোঁটাও ছিল না। দুজনেই তান্ত্রিকদের সঙ্গে মিশত। একজন ফি-রবিবার যেত তারাপীঠ। অন্যজন ঘোর রাজনীতি করত অফিসে। দুজনেই গলায় দড়ি দিল। এর প্রত্যেকটা ঘটনা সত্যি। বানিয়ে গল্প বলার যুগ চলে গেছে। বিশ্বাসই বা করবে কেন লোকে আর আমিই-বা বলতে যাব কেন? যতরকম পাগল, সুইসাইড এইসব দেখেছি তার মধ্যে কয়েকটা ছিল ভালোবাসার ট্র্যাজেডি। কিন্তু এখন মেয়েদের জড়িয়ে কোনো গল্প শোনার সময় নয়। যদিও যে ঘটনাটা শেষমেষ আপনাদের বলেই ফেলব বলে ঠিক করেছি সেটা প্রথমেই বলেছিলাম আমার স্ত্রীকে। অর্থাৎ একটি মেয়েকেই।

তারপরই অশান্তি, ঝুলোঝুলি। কী নিয়ে? না, আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে হবে। আমি সুস্থ সমর্থ পুরুষ, ব্যবসা-ফ্যাবসা ছেড়ে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাব কী দুঃখে? শুনল না। ওর ভাইরা এল। সবাই মিলে ধরে-বেঁধে নিয়ে গেল এক মহিলা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। কী হট্টিচাল্লি কাণ্ড! গিয়ে কিন্তু ভালোই হল। চমৎকার চেহারা। সাহেবি ধাঁচের। তেমন কথাবার্তা। খুব মিশুকে। এত ভালো লেগে গেল যে তাঁকেও ঘটনাটা বললাম। তখন উনি ওই যে ছোট্ট ছোট্ট শাদা বড়িগুলো দিলেন তাই বছরের পর বছর ধরে রোজ তিনটে করে খেয়ে যাচ্ছি। এক-একসময় নীলচে একটা বড়িও খাই। একঘেয়ে লাগে। বিরক্ত হই। তবে মহিলাকে এত ভালো লাগে যে ওঁকে বিশ্বাস না করে পারি না। মনে ভাবতে চেষ্টা করি যে আমি সেরে উঠেছি একটা অসুখ থেকে। অবশ্য আমার কোনো অসুখ নেই।

যে কথাটা বলা নিয়ে এত কথা সেটা কিন্তু পাগল বা সুইসাইডের ব্যাপার নয়। তাও দেখতে দেখতে বছর-তিনেক হয়ে গেল। মাদ্রাজ থেকে ট্রেনে একা একা ফিরছিলাম। ব্যবসার কাজে যখনই বাইরে যাই বেধড়ক উলটোপালটা ঘুরতে হয়। পয়সা বাঁচাব বলে যাওয়ার সময় যাই সেকেন্ড ক্লাসে। কিন্তু ঘুরেফিরে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ি যে ফেরার সময় আরামের লোভে সেই ফার্স্ট ক্লাসই হয়ে যায়। চারজনের খুপরিতে লোক ছিল না। বেশ ফিরছিলাম। অন্ধ্র আর ওড়িশার বর্ডারের দিকে কোথাও হবে। হঠাৎ ঘুমটা ভাঙতে দেখি অন্ধকার। ট্রেনটাও চলছে না। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জানলা দিয়ে বাইরে কিছু দেখা যায় না। একটু পরে চোখ ধাতস্থ হলে বুঝলাম কোনো একটা ছোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গাড়িটা দাঁড়িয়ে। গাঢ় নীল রাতের আকাশ। তার মধ্যে কালো কালো ছোট পাহাড় বা টিলার আভাস। নির্জন কয়েকটা তারা। লোকজনের চলাফেরা। টর্চের আলো। কামরা থেকে নেমে শুনলাম একটা গুড্‌স ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ওটাকে সরাবে। লাইন ঠিক হবে। তবে আমাদের গাড়ি চলবে।

হঠাৎই বলতে হবে, গাড়িতে আলো ফিরে এল। আমিও ফিরে গিয়ে বসলাম। বসেই দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে একজন আগে থেকে আমার খুপরিতে ঢুকে বসে আছে। লোকটা সম্ভবত কেন, নির্ঘাৎ সাউথ ইন্ডিয়ান ছিল না। কথা আর চেহারার ধরণেই সেটা টের পাওয়া গিয়েছিল। চারের কোঠায় বয়স হবে। ফরশা, স্মার্ট, সুপুরুষ। চুলে অল্প পাক ধরেছে। চমৎকার শার্ট, ট্রাউজারস, চকচকে জুতো—গলার টাইটা দেখে মনে হয়েছিল কোনো বড় মাল্টিন্যাশনালের দুঁদে সেলসম্যান। বুঝতে ভুল করিনি তবে কোম্পানিটা যে কী এবং কত বড় সেটা আজও আঁচ করে উঠতে পারিনি। এত বড় যে প্রায় রহস্যময় ও আবছাই বলা চলে।

এ কথা সে কথার পর দুজনেই সিগারেট ধরিয়েছি। ওই দিয়েছিল দামি সিগারেট। একটু হুইস্কি খেতে আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলল যে মদ খায় না। তাই নিজেই খাচ্ছি। ট্রেন ছাড়ার নাম নেই। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। লোকটা প্রায় চমকে দিয়েই বলল—আমাদের একটা কার্ড রাখুন। কাজে লাগতে পারে। কার্ডটা কালো ভেলভেটের মতো কাগজের। তার মধ্যে অস্বস্তিকর চড়া হলুদ রঙে ছাপা একটা ঠিকানা। আর কিছু নেই। ঠিকানাটা দেখলাম ওয়ালটেয়ারের। এপিঠ-ওপিঠ আর কিছু লেখা নেই। না কোম্পানির নাম, না টেলেক্স বা ফোনের নম্বর।

—"ওটা কিন্তু আমাদের আসল ঠিকানা নয়। আমাদের ঠিকানায় যেতে হলে অনেকগুলো জায়গা ঘুরতে হয়। তবে চিঠি যখন দেবেন তখন ডিটেলে আপনার ঠিকানা দিয়ে দেবেন। আমাদের লোক ঠিক দেখা করে নেবে আপনার সঙ্গে। সময় লাগবে একটু। তবে দেখা করবে ঠিকই।"

—"কী ব্যবসা এটা আপনার? সিক্রেটিভ, ইললিগাল কোনো বিজনেস মনে হচ্ছে···আবার কার্ডও দিচ্ছেন—স্ট্রেঞ্জ!"

—"দেখুন, আমাদের কোম্পানির কোনো নাম নেই। নো নেম। উই হেলপ পিপল ডাই—মরণদান করি বলতে পারেন। ব্যাপারটা লিগাল নয় ঠিকই—কিন্তু···"

—"মানে মার্ডার করেন।"

—"এবসলিউটলি নয়। মার্ডার। ছি ছি, উই আর নট কিলারস। আপনার সম্মতি নিয়ে, উইথ ফুল কনসেন্ট এটা করা হয়। নানাভাবে নানা ধরণের মৃত্যু। সেটা আপনি বেছে নেবেন এবং অ্যাকর্ডিংলি পে করবেন। রাজার মতো মরতে চান? পাবেন।

যে-কোনো ডেথ উইশ, যত আনইউজুয়ালই হোক না কেন—আমরা ব্যবস্থা করব। যা চান, যেমন চান তেমনই পাবেন। তবে ওই, দাম দিতে হবে।"

এই লোকটির সঙ্গে তারপর আমার দীর্ঘ কথোপকথন হয়। তার যতটা মনে আছে বলে যাচ্ছি। আজব সেইসব কথা হুইস্কি-খাওয়া মাথায় রাতের অনামা অন্ধকার স্টেশনে যতটা ঢুকেছিল। তিন বছরে যতটা মনে রাখতে পেরেছি।

ওর বক্তব্য ছিল আমাদের মধ্যে নানা কারণে আলাদা আলাদা রকমের মৃত্যু বাসনা থাকে। মানে নিজে কীভাবে মরব সে-সম্বন্ধে একটা প্রিয় কল্পনা ও ইচ্ছে। কেউ হয়তো রোমান্টিক ধাঁচে ধোঁয়া ধোঁয়া সন্ধ্যার ঠাণ্ডা পাহাড় থেকে অতল খাদে ঝাঁপ দিতে চায়। কেউ চায় বুলেটে ঝাঁঝরা হতে। কেউ আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে চায়। কেউ চায় এমন বিষ রক্তে মেশাতে যাতে আলোতে ঝিমধরা দিয়ে শুরু, শেষে হিমশীতল বিদায়। কেউ সচেতন থাকতে চায়, কেউ যেতে চায় আধা-অচেতন অবস্থায়। কেউ চায় তাকে কেউ গলা টিপে মারুক। ছুরি খাওয়ার জন্যে কেউ উদগ্রীব। কেউ চায় তীর্থে মৃত্যু, কানে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ সমেত। কিন্তু চাইলেই তো আর হল না। যাই চাক না কেন বেশিরভাগ ডেথ হয় মোস্ট আনইন্টারেস্টিং ড্র্যাব অ্যান্ড ডাল। এই কোম্পানি সেই মৃত্যুর চাহিদা মেটায়। ক্লায়েন্টদের ডেথ-উইশ ফুলফিল করে। সেলসম্যানের কথাগুলো কিছু কিছু ভারবেটিম মনে আছে।

—"এর থিওরিটিকাল দিকও আছে। আমাদের আর অ্যান্ড ডি দারুণ স্ট্রং। সেখানে দেখবেন মৃত্যুর প্র্যাকটিকাল দিকই নয়—অন্য সব ব্যাপার—টিবেটান বুক অব দা ডেড, ইজিপশিয়ান বুক অব দা ডেড, থ্যানাটস সিনড্রোম, ভারতীয় মৃত্যু-চিন্তা, অভেদানন্দ, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি থেকে শুরু করে লেটেস্ট খুন, সুইসাইড, ক্লিনিকাল ডেথ—যাবতীয় ডাটা নিয়ে ননস্টপ কাজ হচ্ছে। এ ধরণের কারবার ইন্ডিয়াতে ছেড়ে দিন, ওয়ার্ল্ডেও কেউ করছে না। মাথাতেই আসবে না। শুনেছি জাপানে স্মল স্কেলে চেষ্টা হয়েছে তবে এ তো আর ইলেকট্রনিক্স বা মোটরগাড়ির ব্যাপার নয়। একদিকে টয়োটা-মিৎসুবিশি, অন্যদিকে ব্যাটারা এখনো হারাকিরির বাইরে ভাবতেই পারে না। সেই বাঁশের ছুরি, লোহার ছুরি—একদম প্রিমিটিভ। নট অ্যাট অল এন্টারপ্রাইজিং। ইন্সিডেন্টালি, পৃথিবীতে কোন দেশের লোক সবচেয়ে বেশি সুইসাইড করে বলুন তো?"

—"আমরাই বোধহয়!"

—"নো স্যার, হাঙ্গেরি। ম্যাগিয়াররা সাংঘাতিকভাবে সুইসাইডপ্রোন।"

নানা ধরণের মৃত্যুর সন্ধান পাওয়া যাবে এদের কাছে। এমনকী জটিল ও প্রায় অসম্ভব কোনো প্রস্তাব থাকলে সেটা কাজে করারও ব্যবস্থা এরা করে। দিল্লির এক ভদ্রলোকের প্রিয় মৃত্যুকল্পনা ছিল বরফ ঢাকা পাহাড়ি রাস্তা থেকে জিপ স্কিড করে নীচে পড়ে যাচ্ছেন। তাই হল। নির্দিষ্ট কোনো অসুখে মরার ইচ্ছে থাকলে এদের মেডিকাল টিম সেটা সম্ভব কিনা দেখবে। তবে অন্য কারো মৃত্যুর ব্যাপারে এরা অন্যের কথায় রাজি হয় না। কেবল নিজের মরারই ব্যবস্থা এদের সঙ্গে করা যায়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলাম। অনেকে নাকি এমনই হতভম্ব জীবন বাঁচে যে মরার একটা ভাসা ভাসা আইডিয়া থাকলেও সেটা ভালো বোঝাতে পারে না। তাদের জন্যে কয়েকটা সেট প্রোগ্রাম আছে এদের। যার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় হল 'রেকর্ড প্লেয়ার'।

বিশাল এক রেকর্ড প্লেয়ার সমুদ্রের মধ্যে বেশ দূরে বসানো আছে। তার ওপরে

বিরাট এক কালো রেকর্ড, মৃত্যুর রেকর্ড। থার্ট্রিথ্রি ওয়ান থার্ড স্পিডে ঘোরে। সমুদ্রের তলা থেকে তেল বের করার জন্য যে অফ-শোর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় তেমনই একটা কাঠামোর ওপরে বসানো আছে রেকর্ড-প্লেয়ার। সেখানে যেতে হয় স্পিড বোটে। রেকর্ডের ফুটোর মধ্যে যে জিনিশটা থাকে সেই ঊর্ধ্বমুখী বুলেট বা লিপস্টিকের মতো বস্তুটির ওপরে একটি চেয়ারে মরণকামী ভাগ্যবানের বসার ব্যবস্থা। রেকর্ডটি অসম্ভব এক গম্ভীর শোকাবহ সংগীতের—পশ্চিমি বা দেশীয়। রাখমানিনভের আইল অফ দা ডেড বা করুণ সারেঙ্গি—যা চাইবেন তাই। কয়েক হাজার ওয়াটের আওয়াজ মানুষটিকে আচ্ছন্ন করে। রেকর্ডটি ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের মধ্যে সেও ঘুরতে ঘুরতে আচ্ছন্ন হয়ে বাস্তব-অবাস্তবের বাইরে চলে যায়। পিক-আপ, অর্থাৎ স্টাইলাস যাতে থাকে সেটি শেষে রেকর্ডের বাজনা শেষ হবার পরে ঝড়ের শব্দ তুলে মাঝখানের কালো, সমান, চকচকে জায়গাটায় ঢোকে এবং এর ধাক্কায় মানুষটি ছিটকে যায়। এই প্রচণ্ড আঘাতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ার মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। তার মাথাটা হয় ছিঁড়ে যায় বা থেঁতলে যায়। মৃতদেহটি সমুদ্রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গন্ধ পেয়ে অসংখ্য হাঙর ছুটে আসে। এর জন্যে টাকা লাগে অনেক। খুব কম লোকেই অত খরচ করতে পারে। এখন অবধি দুতিন জনের বেশি মৃত্যুর রেকর্ড শোনেনি।

—"তাঁরা কারা?"

—"মাফ করবেন। ক্লায়েন্ট হল ভগবানেরও বেশি। তাঁদের আইডেনটিটি আমরা ডাইভালজ্ করতে পারব না। অবশ্য বেশ বন্ধুত্বই হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। মিঃ—কীভাবে মারা গিয়েছিলেন বলুন তো। মনে থাকার কথা।"

—"মনে থাকবে কী বলছেন। ওরকম বীভৎস প্লেন ক্র্যাশ!"

—"প্লেন ক্র্যাশ ঠিকই তবে উনি ওটাই চেয়েছিলেন।"

—"কিন্তু সঙ্গে যারা ছিল? তারা তো চায়নি।"

—"সরি। এর জন্যে সাংঘাতিক হাই প্রাইস দিতে হয়। অন্য ভিক্টিম থাকে বলে।"

—"কিন্তু তারা তো ইনোসেন্ট!"

—"ইনোসেন্ট! মাই ফুট! তাতে আমাদের কিছু করার নেই। তাদের কেউ মারতে বলেনি। গায়ে পড়ে তারা যদি একই প্লেনে চড়ে বসে থাকে, আমরা কী করব? মোরওভার এটাই ছিল তাঁর চয়েস। হ্যাঁ, চয়েস। বাছাই। আমরা ওঁর কথায়, ওঁর পেমেন্টের ভিত্তিতেই সবটা ব্যবস্থা করেছিলাম।"

—"কিন্তু উনি এটা করলেন কেন?"

—"কেন? একইভাবে উনি মিঃ—কে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তখনো অনেক ইনোসেন্ট লোক মারা গিয়েছিল। তাই সেই একই মৃত্যু উনি চেয়েছিলেন।"

—"আপনাদের এরকম আরো কত কাজ আছে?"

—"নিউমেরাস। কিন্তু সব আপনাকে বলতে যাব কেন? সবটা কী বলা যায় না বলা উচিত? অনেক কিছু করি আমরা। সুইসাইডের প্রোজেক্ট সেল করি। খরচ কম লাগে। আরো কত কী। এইটুকু জেনে রাখুন, হাল আমলে যত ফেমাস লোক মারা গেছে—সে বোম্বের মাফিয়া লিডারের গাড়ি মেশিনগানড হওয়া থেকে শুরু করে কলকাতায় ফিল্মস্টারের সুইসাইড—হাতে টেলিফোন, পেটে চল্লিশটা স্লিপিং পিল সব, সব আমাদের কোম্পানির ব্যাপার। আর পলিটিকাল লিডারস তো আছেই। ভেরি ইজি টু হেলপ দেম—অল অফ দেম প্রেফার হার্ট অ্যাটাক।"

—"আপনারা তাহলে শুধু ফেমাস যাঁরা তাঁদেরই হেলপ করেন। মানে মরণদান?"

—"দেখুন, এখনো আমরা কোম্পানি দাঁড় করাচ্ছি। ব্রেক ইভেন হতে দেরি আছে। তবে হ্যাঁ, পারফরমেন্সের প্রাইড—এটাই আপাতত আমাদের মেজর ক্যাপিটাল। পরে অবশ্য ইকনমিকালি উইকার ক্লাসের জন্যেও আমাদের ভাবতে হবে। সত্যি বলতে, গরিবদের নিয়ে ঝামেলা অনেক বেশি। শালারা বেঁচে আছে কিনা তাই জানে না, মরার কথা কী ভাববে? তাছাড়া ওরা অসম্ভব ক্রুড।"

—"ধরুন, আরো তলায় যারা—মাইলস বিলো পভার্টি লাইন—বেগারস।"

—"ইমপসিবল! লাস্ট ইয়ার কলকাতা, বোম্বে আর মাদ্রাজ—এই তিন মেট্রোপলিটান সিটির কয়েকজন বেগারের ডেথ উইশ আমাদের আর অ্যান্ড ডি স্টাডি করেছিল। ওদের ফাইন্ডিং কী বলব—সিলি অ্যান্ড ডিলাইটফুল। শিশুসুলভ আবদার।"

—"যেমন?"

—"খাওয়ার ইমেজটা আসেই বেশিরভাগ কেসে। ধরুন কেউ চায় যে হাত পা মাথা বুক সব মাংস মাখন মদ ডিম মাছে ভর্তি হয়ে ফুলে উঠে ফেটে যাবে। মদটা খুব চায় ওরা। কেউ আবার বলল ফ্লোরা ফাউন্টেনে ভগবান এসে ওকে কোলে তুলে নিক। চাইল্ডিশ, রাদার নেভ।"

—"ওদের কিন্তু ইম্যাজিনেশন আছে বলতে হবে।"

—"তা আছে। মানুষ যখন, থাকবেই। তবে হ্যাঁ, বাচ্চারা মানে শিশুদের কাছে অনেক ভ্যালুয়েবল আইডিয়া পাই। এই তো সেদিনই আমাদের আর অ্যান্ড ডি অ্যামেরিকান কাগজ ঘেঁটে ফ্যাসিনেটিং একটা স্টোরি বের করেছে।"

—"বলুন না!"

—"একটা ছেলে, বুঝলেন। বছর বারো হবে। শিকাগোর ধারেকাছে কোথাও। ব্যাটা ব্যাটম্যান সেজেছিল। সারাক্ষণ তিনি ব্যাটম্যান। দু-পিস ডানা লাগিয়ে ছাদ থেকে ছাদে লাফিয়ে বেড়াতেন। কেউ তাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। মেয়েরাও হাসাহাসি করত। চাইল্ডের মন তো। ভাবল ব্যাটম্যানকে চিনলে না তোমরা? একদিন দেখা গেল ডিপ ফ্রিজারের মধ্যে ঢুকে কদিন ধরে জমে বরফ হয়ে রয়েছে। কতরকম কেস যে আছে শুনলে থ মেরে যাবেন। ব্যাটম্যান! আসলে মাল খাই না তা নয়। হুইস্কি ঢালুন দেখি একটা স্ট্রং করে। কী নাম হুইস্কিটার? গ্লেনডার! আরে এ যে স্কচ দেখছি। কখনো নামটা শুনিনি তো।"

আমি ঢেলেছিলাম। সেলসম্যানের জন্যে। নিজেরও জন্যে। বেশ কয়েকবার ঢালাঢালির পরে সে ব্যাটম্যান বা বাদুড় মানুষের মতোই ঝুলতে ঝুলতে চলে গিয়েছিল। আমিও ঝুলতে ঝুলতে বিছানায়। ট্রেন চলতে শুরু করেছিল। কানে তখনো তার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম—

—"তবে হ্যাঁ, মৃত্যুর মধ্যে যে গ্র্যান্ড সারপ্রাইজ আছে, বিশেষত অ্যাকসিডেন্টাল মৃত্যুতে, তার থ্রিল থেকে আমরা কখনো আমাদের ক্লায়েন্টদের ডিপ্রাইভ করি না। কেউ হয়তো মোটর গাড়িতে চাপা পড়ার জন্যে বুক করেছেন। কখন, কোথায়, কোন রাস্তায় যে তিনি চাপা পড়বেন সেটা কিন্তু হাজার চেষ্টাতেও আঁচ করতে পারবেন না। সাডেন ডেথের যে ভার্জিন চার্ম, সেটা থাকবেই।"

এই লোকটা কে ছিল? তার কোম্পানিটিই বা কী? মরণদান—আইডিয়াটা কিন্তু এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনবছর চেষ্টা করেও তা পারলাম না। দ্বিতীয়ত,

আমাদের মধ্যে কি মরে যাবার এক-একটা ধারণা নেই? সেটা কি এই একবারের বা এবারের জীবনে হবে, ঘটবে? যেমন ধরুন, আমার নিজেরই তো একটা ইচ্ছে আছে। তবে মৃত্যুর সেই রেকর্ড প্লেয়ারের খরচা অনেক। হবেই তো! এইসব ধন্দ আর খটকা নিয়েই আছি। নিয়ম করে ওষুধ খেলে এগুলো কম থাকে। বেড়ে গেলে সেই মহিলা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাই। ওষুধ পালটে দেন। শাদা বড়ির জায়গায় নীলচে বড়ি। লোডশেডিঙের অন্ধকারে মাঝে মধ্যে লোকটার দেওয়া সেই কালো কার্ডটা বের করে দেখি। অস্বস্তিকর হলুদ ছাপাটা বোধহয় ফ্লুরেসেন্ট রঙে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। যোগাযোগ করলে কার্ডটা দেখাতেও আপত্তি নেই। তারপর নিজেরাই চিঠি লিখে যাচাই করে নিতে পারবেন। সময় লাগবে একটু কিন্তু ওদের লোক ঠিক দেখা করে নেবে আপনার সঙ্গে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। দেখা ওরা করবেই।

১৯৯০

মাথা নেই তো হয়েছে কি

হায় গো তেলমাখা চুকচুকে বদখৎ বিরিঞ্চির মাথা। ঘিলুর তেল, তার পরতে পরতে বদবুদ্ধি, শুলুকসন্ধান, মুনাফাবাজি হায় হায়। সেই একবার বেবিফুড লুকিয়ে মজুত করেছিলে বলে গোটা পাড়ায় মুখে মাথায় চুনকালি মেখে ঘুরেছিলে না বাবা? সেই ভুতুড়ে মুণ্ডু কোথায় হাফিস হল বাপ? কোনো কবুতর, হাট্টিমাটিম বা ওই জাতীয় হাড়বজ্জাত পাখি যদি রাতের এই আকাশে সেই আরো মান্ধাতার আমলের বিরহী পাখির মতো করুণ চিৎকারে "বিরিঞ্চি, তুমি কোথায়" বলে ককিয়ে ওঠে তাহলে বিরিঞ্চির মুণ্ডু হেগোখাল থেকে মুখ তুলে "আমি এখানে" বলে সাড়া দেবে না। বিরিঞ্চি যা শুনলে উদাস হয় সেই "তুমি আমার, আমি তোমার, আমি যে তোমার কে বুঝে নাও" আর কখনো শুনবে না। বেশ্যাবাজারের অমোঘ নিয়মে বিরিঞ্চি নিকেশ হয়েছে ইতি ০০৭ বা লেখক, ছেলে ভালো তবে ওই একটু পেঁয়াজ খায়। সিনসিনারি দর্জিপাড়া পার্ক। ওপাড়ায় বেপাড়ায় এখন জমেছে ব্রেক ডান্স। করোটি ফাটার শব্দ। ছিল চাঁদ এমন যে চারদিকে ম ম করছিল ডাইনি পোড়ানোর আলো।

বিরিঞ্চি ঘেমেছিল। দুপুরে কষে ইলিশের তেল, ডিমভাজা, কচুর শাক দিয়ে মুড়ো, ঝালঝোল খেয়েছে। ইলিশ মাছে খুব হিট থাকে। তেলের গরম। আর দোকানে যায়নি। বালিশে নাক গুঁজে ঘুমিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে মাথা ভেপসে আছে, থমথমে গুমরো গুমরো ভাব। থুম্বো মেরে বসেছিল। মেঘ-মেঘমেঘা, ঘোমটা মাথায় কে গা? ঝি এসে চা দিয়ে গেল। খেল। সিগারেট ধরাতে মাথাটা খুলল। আজ যেতে হবে। যাওয়ার জন্যে শরীরটা আনচান করছে।

এই যাওয়া যে কতকভাবে হয় তার ইয়ত্তা নেই। গৌর পাল হয়তো নবীনচাঁদকে বলল, "এতদিন ধরে তো যাতায়াতি করলুম। মন্দ লাগচেও বলব না। তবে আজ কিন্তু তোমার হাতে খাব ভাই।" নবীনচাঁদ মাধবীর কাছে যায়। গৌর পালেরও যাওয়া হল।

তেল কোম্পানির সারপ্লাস পুল-এ কতকগুলো হাড়গিলে বুড়ো বসে থাকে। লাঙল যার জমি তার শুনে বলে—কি বলে শুনেচো, এর পরে তো বলবে পালকি যার বউ

তার। বসে বসে মাইনে খায়। রোজ দেখা হলে বলে "এই নাককান মলচি। আর নয়। ঢের হয়েচে।" অন্য বুড়ো বলে "তোর জন্যেই তো। বিকেল গড়ালেই তো গ্যাঁজগ্যাজানি চেগে উঠবে।" ঠিক তাই হয়। বিকেলের দিকে এক বুড়ো বলে "কি! একটু ঘুরে যাবে নাকি। এতদিনের একটা রেওয়াজ, এককথায় ছেড়ে দেওয়া কি ভালো?" "না ভাই, ঘর সংসার আচে।" "দিব্যি খাচ্ছি এই শেষবার। রেস্তয় টান থাকে তো বল। পরে দিও।" শেষ অব্দি যাওয়া হয়। নানা লোক নানা কারণে, নানা দরকারে যায়। এভাবেই হয়ে ওঠে বেশ্যাগৃহে যাওয়া। রোজ যত লোক যায় তারা যদি যুক্তি করে একটা মিছিল করে যেতে থাকে তাহলে একেবারে ভির্মি লেগে যাবে। খুচরোখাচরা একা যায়, দঙ্গল বেঁধে যায়, উঁকি দিতে দিতে ফুড়ুক করে ঢুকে পড়ে, পান সিগারেটের দোকানে দাঁড়িয়ে দোনামোনা করে কিন্তু ঠিকঠাক পৌঁছে যায়। প্রথমে মিনিবাস, তারপর দোতলা বাসে চড়ে বোতল বগলে বিরিঞ্চিও পৌঁছে গেল বেশ্যাপাড়ায়। তখন করাল চাঁদ আকাশের বুকের লোমে বিলি কাটছে এবং ডিজেল পেট্রল ও নানারকম খাবারের তেলতেলে ভাপ মেঘের তলায় আর এক জাতের চাঁদোয়া বানিয়েছে।

সেই যে সেই মেমসাহেবদের হোস্টেলের গল্পটা। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুফল বিরিঞ্চিও ভোগ করছে। পরে জানা যাবে যে কোনো কোনো গণিকাও কী বিচিত্রভাবে এই অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়েছে। খাঁজকাটা কন্ডোমের বিজ্ঞাপন কি কাগজে দেদার ছেপে বেরোচ্ছে না? ওদিকে বিরিঞ্চি তার পাড়ার বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের মাসিক আনন্দমেলায় ভাড়া করা ভিডিওতে প্রথমে টু-এক্স ও পরে থ্রি-এক্স ব্লু ফিল্ম দেখে থাকে এবং প্রভূত আনন্দ পায়। এ বছর বড় ছেলে হিরো হন্ডা কিনেছে বলে বিরিঞ্চি কিপটে হয়ে গেছে। বউ মালতীমালা বার বার ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার (ভিসিপি) কিনতে বলায় জবাব দিয়েছে—"দুটো পয়সা জমতে চাইছে, জমতে দেবে না। কেমন ছুজ্জুতি! এই বুড়ো বয়সে এত কি তোমার কুটকুটুনি গো।" ছোট ছেলের নাম চাঁদু। সে কিন্তু ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার (ভিসিআর) খরিদ করতে চায়। গভীর রাতের ছায়াছবি ধরবে বলে। কিনে দিতে তো হবেই। তবে ওই খুঁতো গরু। বাঁট ঝুলবে, দুধ পাবে না, বাড়িতে বসে তো আর থ্রি-এক্স ব্লু ফিল্ম দেখা যাবে না।

বিরিঞ্চি পানবাহার খেতে খেতে রাস্তার থেকে ফুটপাথে পা ওঠাতে গিয়ে ছত্রাকার বমি দেখে এক লাফ মারল। কোন শালা বমি করেছে ছড়িয়ে। টোকো গন্ধ। আরো পানবাহার মুখে দিয়ে গলিতে ঢোকে। মদন এগিয়ে আসে। মদন, চেনা খদ্দের অচেনা খদ্দের—সকলের দিকেই এগোয়। মদনের গেঞ্জিতে লেখা 'ম্যারাডোনা'।

—"কি গো ভেড়ে মদন! হাতিরা সব কী বলচে?"

—"আজ সার ভেড়েমদন, গোঁড়ে মদন যা বলবেন খুদ্‌গর্জ বলে যান। আজ আর হাতি নেই যে হাওদায় চড়বেন।"

—"সে কি গো!"

—"আজ হেভি ভিড়। ঘরে ঘরে জোড়া জোড়া খদ্দের। কেসটা কী বলুন তো। আমরাই তো বেবাক তাজ্জব মেরে যাচ্চি। কাল পরশু মাছি তাড়ালাম। আজ শালা একেবারে হাউসফুল। ক্যাটার হয়ে যাচ্ছে।"

—"আলতা, ফুলরানী, তারপর তোমার গিয়ে ওই চুনমুন! না হলে সেই তেলেঙ্গী মাগীটা কী নাম যেন! ওই যে ন্যাবা হয়েছিল যার।"

—"তো কী বলচি আপনাকে। আজ শালা কোতায় সেই টিকিয়াপাড়া, বনগাঁ, সেই

কোতায় গোড়ে, বোড়াল—পার্টি একেবারে ঝেঁটিয়ে এসেচে। টেসকি করে এল তো ডাইভার অব্দি গাড়ি তালা মেরে ঢুকে পড়চে। কতগুলো সায়েব এসেচে জাহাজি। কেয়া সেল, কেয়া খুশবু!"

—"তবে কি গতর খাটিয়ে এসে বেফয়দা ফিরে যাব। একটা লাইন কর বাবা। না হয় তোকে বেশি করে দেওয়া যাবে।"

—"দেওনা-থোওনা নিয়ে কবে কিছু বলিচি আপনাকে। অবশ্যি একটা জায়গা আচে—যাবেন?"

—"এমন ভিড়ভাড়াক্কায় খালি? সেই নাক নেই, কান নেই—ভাল্লুকপাড়ায় ল্যাম্পপোস্টে চড়ে বসে থাকে—সেই মাল নাকি?"

—"তা না, কী যে বলেন? মাল গ্যারান্টি করা। দেখলে দরদাম লম্বা-চওড়া করে নেবেন। তবে খুঁত একটাই।"

—"খোলশা করে বল না।"

—"স্যার, ধড়, আড়া সব আচে। মাথা নেই।"

—"সে কি হে! মাথা নেই? জ্যান্ত তো! না বাবা, আবার মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়ব।"

—"আপনি না মাইরি স্যার। আলফাল কী বকচেন বলুন তো। বাজারে মাল নেই। সব কামরা জাম্প। তখন চেয়েচিন্তে একটা সাঁটিস পিস বের করলুম তো নাও—ফ্যাকড়ার পর ফ্যাকড়া!"

—"সাঁটিস মাল। নিজেই তো বললে মাথা নেই।"

—"মাথা নেই তো হয়েচে কি? মাথা, মাথা—মাথার সঙ্গে কোনো কারবার আচে আপনার? মাথা মারাচ্চে।"

বিরিঞ্চি কথাবার্তায় আরো গরমে যায়। ফোঁস ফোঁস করে রফা করে। কালো বোঁচা নাকের পাশে তেল ফুটছে।

—"বেশ চলো। তাই যাব।"

মদনের পেছনে পেছনে বিরিঞ্চ হোঁচট খেতে খেতে দৌড়োয়। এভাবেই শেষমেষ যাওয়া হয়।

ইট বের করা আদ্যিকালের রোগা সিঁড়ি। মড়া নামাতে হলে কালঘাম ছুটে যাবে। ওপর থেকে খিলান নেমে হঠাৎ কপালের কাছে চলে এসেছে। ঘুলঘুলিতে কেমন বাদুড়ে বাদুড়ে গন্ধ। এ তো ভিডিও। অন্যদিকে অডিওতে টুকটাক গানের কলি, হাসির, রেডিওর শব্দ—চারদিকে বারান্দা মাঝখানে উঠোন। সেখানে কেউ দমাস দমাস করে কাপড় কাচছে। বাংলা বিলিতি মালের মিশ খাওয়া গন্ধ।

মদন দরজায় টোকা দেয় তিনবার। ভেতরে ডিসি এলাকার পুরোনো ভারী ফ্যান ঘোরার শব্দ। লাল আলো জ্বলছিল। এবার ছোট টিউব ফড়ফড় করে জ্বলে ওঠে। বিরিঞ্চি মালের বোতলটা বগলে চেপে ধরে। মদন দরজা ঠেলে দেয়। দরজার ঠেলা খেয়ে শাড়ির পরদা সরে যায়।

—"যান, পরদা সরিয়ে ঢুকে যান।"

মাথাবিহীন বেশ্যা খাটের ধারে বসেছিল। বিরিঞ্চি ঢুকতে উঠে দাঁড়ায়। নাইলনের নীল শাড়ি পরা। গায়ে জামা নেই। কালো কিন্তু বেশ ফুলকো। গলা অব্দি উঠে হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। মাথা নেই। বিরিঞ্চি শোনে মদন ফিরে যাচ্ছে শিস দিতে দিতে।

মাথাবিহীন বেশ্যা নির্বাক। কিন্তু অসহায় নয়। শাড়ি ঢাকা দেওয়া দুটো ট্রাঙ্ক। তার ওপরে ফুলদানিতে প্লাস্টিকের টাটকা ফুল। তার পাশে রাখা একটা ক্যাসেট রেকর্ডার। বেশ্যা প্রথমে সুইচ টিপে টিউব নিভিয়ে দেয়। সারা ঘরে শুধু আবছা লাল আলো। বেশ্যা এবারে ক্যাসেট রেকর্ডার বাজিয়ে দেয়। ক্যাসেট ঘুরে ম্যাগনেটিক টেপ আসতে সময় লাগে একটু। কিরকিরে একটা শব্দ। তারপর বেশ্যার গলার আওয়াজ বেজে ওঠে। একটাই ডায়লগ। পরপর অনেকবার আছে।

—"বসবেন না গান শুনবেন? বসবেন না গান শুনবেন? বসবেন না গান···"

বিরিঞ্চি ভয়ের চেয়ে মজা বেশি পেয়ে গেছে। আইডিয়াও পেয়ে গেছে। দোকানে সেও ক্যাসেট বাজিয়ে দেবে—আজ নগদ কাল ধার, আজ নগদ কাল ধার, আজ নগদ কাল···।

বিরিঞ্চি মালের বোতলটা কুরুস কাঁটায় বোনা শাদা জালি ঢাকনা চাপা দেওয়া ছোট টেবিলে রাখে। সিগারেট ধরায় ও হেসে ওঠে। বেশ্যাও ক্যাসেটের স্টপ নব টেপে। ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে। আবার বাজায়। এবার শোনা যায় ধাতব হাসি। বহুদিন আগে তোলা। তখন বোধহয় কালীপূজার ভাসান হচ্ছিল। কারণ হাসির ফাঁকে ফাঁকে "কালী মাইকি জয়!" ও তাসার আওয়াজ শোনা গেল।

হাসি বাজতে থাকে। লাল আলোর মধ্যে হাসি। বিরিঞ্চিকে ছুঁয়ে বেশ্যা একবার ঘুরপাক খায়। লাল আলোর মধ্যে নীল নাইলন জড়ানো ওঃ একেবারে দিওয়ালি কি মিঠাই। বেশ্যা নাচের ভঙ্গিতে যায়। দরজা বন্ধ করে। ফুল ও হরিণ আঁকা দুটি গেলাশ এনে ছোট টেবিলে রাখে। গিয়ে ক্যাসেট পালটায়। নতুন ক্যাসেট লাগায়। টারজান। নায়িকা নানাবিধ হিংস্র জন্তুকে ডাকছে সুরেলা। মেরে পাস আও না—মেরে সাথ গাও না। বুনো জন্তুরা ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে সাড়া দিচ্ছে।

বিরিঞ্চি ঢকাঢক মাল খায়। ঘোঁত্ ঘোঁত্ করে। কুস্তিগিরের মতো ভাবভঙ্গি করে। তৈরি হয়। ধুন্‌কির মধ্যেও তার বুদ্ধি ছিল। মনে মনে ভাবে—দারুণ ধারালো কিছু দিয়ে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে থাকবে। বড় ব্লেড বা কাগজ কাটার মেসিনে যেমন ভারী ফলাটা নেমে আসে। অথবা হয়তো মাথা কখনো গজায়নি এমনও তো হতে পারে। কত কি তো হয়। এত বুঝেও কিন্তু একবার মোক্ষম ঠকে যায় বিরিঞ্চি। চুমু খেতে গিয়ে পুরো ফাঁকার মধ্যে ঢুকে যায়। অভ্যেসের দোষে হয়ে গেছে। এরপর আর চুমুর দিকে এগোয় না। মানে মুখ খোঁজে না।

গলির মুখে আলো নিভিয়ে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। তাতে তিনজন কুখ্যাত গুণ্ডা—বংশী, ছোবেলাল আর কেলেপচা বসেছিল। ট্যাক্সির যে আসলি ড্রাইভার সে তখন গামছা দিয়ে মুখ বাঁধা হয়ে তারাতলায় রাস্তার ধারে মাথা ফেটে বেহোঁশ হয়ে পড়েছিল। খুবই দুষ্ট এই সমাজবিরোধীরা। আজকাল এরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে কোথায় কি করতে নেই সেটুকু বোধবুদ্ধিও এদের লোপ পেয়েছে। গত ১৬ আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের ফুল শুকোতে না শুকোতে, রবিবার, খোদ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ডিসি (সাউথ) স্বয়ং গিয়ে সাত জন যুদ্ধরত ম্যাগনিফিসেন্ট সেভেন গুণ্ডাকে অ্যারেস্ট করেন। সেখানে 'সোলজার'-এর গ্যাঙের সঙ্গে 'স্টিলবডি'-র গ্যাঙের ঘামাসান ফাইটিং চলছিল এবং হাতের তালুতে বোমা ফেটে গুলি ওরফে শেখ তাল্লু মারাও যায়। খবরের কাগজে লিখেছে "একসময় উত্তেজিত জনতাকে হঠাতে পুলিশ লাঠিও চালায়।··· রবিবার রাতে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে হানা দিয়ে কয়েকটি তাজা বোমাও উদ্ধার করা হয়।

সম্প্রতি সেখানে পুলিশি হানায় প্রচুর পরিমাণ বেআইনি মাদকদ্রব্যও আটক করা হয়।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ আগস্ট) আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে যদি এই কাণ্ড হতে পারে তাহলে অন্য যে কোনো হেঁজিপেঁজি পাড়ায় বা মহল্লায় কি ঘটতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আর হয়েছে গৃহবধূদের অস্বাভাবিক মৃত্যু। সুইসাইডাল নোট। স্বামী গ্রেপ্তার। তার ওপরে ট্যাবলেট, হেরোইন, স্ম্যাক, ব্রাউন সুগার—বল তো ভাই বিরিঞ্চি কোন মায়ের লাল বাবা আছে যে এই দরিয়া পার করেগা?

ও লো গভীর রাত। চাঁদের শরীর ভেঙেছে। অল্প রাতে সে বিলি করেছিল ডাইনি পোড়ানোর আলো। এখন হয়েছে নিভে আসা চিতার হলদেটে আভা। শহরের পাগুলো খসে চিতার বাইরে ঝাঁপ খেয়েছিল—ডোমের বাঁশের সামান্য টুসকিতে উলটে আবার আগুনে। কাঠকয়লার ফুলকি খলবলিয়ে ওঠে। মাংস পোড়ার গন্ধ, চুল পোড়ার গন্ধ পায়ে পায়ে হেঁটে দরজায় দরজায় টোকা দিয়ে বেড়ায়। কুচকুচে কালো বেড়াল লাফ দিয়ে নেমে রাস্তা পার হয়। তার চোখ লুব্ধক নক্ষত্রের মতো জ্বলে।

বিরিঞ্চি টলতে টলতে রাস্তায় বেরোয়। বেশ দূরে হলেও ট্যাক্সির ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে কেলেপচার এক্সপার্ট চোখ লেসার রশ্মির মতো তুখোড়ভাবে বিরিঞ্চির শরীরের আদলটা সার্চ করে নেয় এবং ল্যাম্পপোস্টের আলোয় গলায় ঝিলিক দেখে চর্বির ফাঁকে আটকানো সোনার ফাইন চেনটা সাইজ করে ফেলে। বিরিঞ্চি তখন গান করছিল। "ওপারের ডাক যদি আসে··· আমি যে তোমার কে বুঝে নাও।"

ট্যাক্সির দরজা খোলে ঘাড় মটকাবার মতো শব্দ করে।

—"টেক্সি চাহিয়ে বাবু। ঘর যানা হ্যায়।" বিরিঞ্চি হাসে এবং বলে,

—"মাথা নেই তো হয়েচে কি? আরামে তো কোনো ঘাটতি নেই ভাই।"

কেলেপচা বিরিঞ্চিকে হাতেঘেরাও করে তালগোল পাকিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়। ছোবেলাল পাশে ফিট হয়ে যায়। মিটার ডাউন হয়। বংশী স্টার্ট দেয়। ডিজেল মার্ক ফোর। ইঞ্জিনের ঝাঁকুনি বেশি। বডি থরথর করে। স্টার্ট দেয়। ভালো চালায় বংশী। চাকা গড়াতে না গড়াতে গিয়ার পালটায়। চোরাই গাড়ি হলেও গাড্ডা বাঁচায়। ভেবে করে না, ভালো চালায় বলে হয়ে যায়। বড় মোড়ের কাছে স্লো হয়। ডানদিক বাঁদিক মামাদের ভ্যান বা জিপ আছে কিনা সাপটে দেখে নেয়। তারপর ঝাপটে বাঁদিকে ঘুরে যায় ট্রামলাইন বরাবর। বিরিঞ্চি তখন হড় হড় করে বমি করছে। ছোবেলাল ওকে গাড়ির তলায় ঘাড়টা চেপে ধরে থাকে। বমির দমকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

—"উল্‌টি করচে গুরু।"

—"উলটো করে দে না। শালা ছেটকাবে।" বিরিঞ্চি ঠেলে আবার উঠে বসে। বমির ফ্যানা, বমির সুতো মুখ থেকে ঝুলছে। বাইরে শহরের মাঝরাতের আলো। আলোগুলো গোঁত্তা খাচ্ছে। একটা আলোর থেকে অনেক আলো উড়তে উড়তে বেরোচ্ছে। বিরিঞ্চির বেদম হাসি আসে।

—"মাথা নেই তো হয়েচে কি? ওঃ যা জমেচে আজ। গাড়ি ঠিক ঠিক হাঁকাচ্ছো তো ভায়া।"

—"আমাদের জিম্মায় যখন আচেন তখন সেঁটে বসে থাকুন। একেবারে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে আসব।"

—"সেই ভালো। ঢুকে সোজা খাট।"

বিরিঞ্চি চোখ বন্ধ করে কিন্তু দমকে দমকে গান ও বমি পায় তার।

—"তুমি আমার, আমি তোমার··· ওয়াক্।"

ছোবেলাল খেপে যায়।

—"এ শালা প্যান্টে ফ্যান্টে মাখিয়ে দিল মাইরি। আবে এ মোটকা··· এ মোটুয়া!"

বিরিঞ্চি তাকায়। এবং ছোবেলালকে জড়িয়ে ধরে।

—"এই তো। মাথা আচে দেখচি।"

—"কি বলচে গুরু। মাথা আচে।"

—"ধুস্—কিছু জানো না ভায়া। আসল কথা হচ্ছে মাথা নেই তো হয়েছে কি? কোনো অভাব তো বোধ করিনি।"

ওরা হেগোখালের পাড়ে ট্যাক্সি থামায়। অনেক দূরে কয়েকটা আলো চিকমিক করছে। প্যাঁচা ডাকল কোথাও। কাদা, গু, পচা পানার গন্ধ। হাতল ভাঙা রিকশা উলটে রয়েছে।

ওরা বিরিঞ্চির গলা থেকে হারটা ছিঁড়ে নেয়। জামাটা ফাঁৎরাফাঁই করে ছেঁড়ে। হাতঘড়িটা খুলে নেয়। গেঁজের থেকে দলাপাকানো ঘামে ভেজা নোট নেয়। পকেটের চিরুনিটা ফেলে দেয়। খুচরো পয়সাগুলো নেয়। তারপর ভাঙা রিকশার পা রাখার জায়গায় বিরিঞ্চির ঘাড়টা চেপে ধরে বংশী। ছোবেলাল মাথা কাটা দেখেনি কখনো। সে খালের জলে প্যান্টের বমি ধোয়। কেলেপচা একদিকে ভোঁতা, অন্যদিকে মাখনধার কাতান দিয়ে পোঁচ দিয়ে দিয়ে বিরিঞ্চির মুণ্ডু কাটে। মাতাল ধড় ধড়ফড় করে কম। বিরিঞ্চির ধড়টা খালের ধারেই পড়ে থাকে। মাথাটা ছুঁড়ে ওরা জলে ফেলে দেয়। মাথাটা পানার গাদায় গিয়ে পড়ে। তারপর মাথার ভারে একটু একটু করে পানা ডুবতে থাকে। মাথা উলটে ছিল। জল চুল ভেজায়। তারপর কপাল ডোবে। চোখ ডোবে। নাক ডোবে। মুখ ডোবে। মুখে জল ঢোকে। রক্তমাখা কাটা গলাটা চাঁদের আলোয় কালচে গর্তের মতো দেখায়। তারপর সেটাও ডুবে যায়।

ট্যাক্সিটা স্টার্ট দেয়। ব্যাক করে। তারপর প্রচণ্ড জোরে ফার্স্ট গিয়ারে গাঁ গাঁ করে ঢাল বেয়ে খালপাড়ের রাস্তায় ওঠে। গর্তে আছড়ায়। তারপর কালভার্টে ছোট একটা ধাক্কা মেরে ডানদিকে ঘুরে হাওয়া হয়ে যায়। আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে থাকে। এবারে মিটার ডাউন করার ঘণ্টা বাজেনি।

কথিত আছে মাথা আলাদা করার এই খেলা নাকি স্বয়ং উত্তমকুমার নিশিভোরের ময়দানে দেখেছিলেন। তারপর পাতাল রেলের কাজের সময় মনোহর দাস তড়াগ থেকে মুণ্ডহীন কঙ্কাল কি পাওয়া যায়নি? ইতিহাসের সেই নিয়ম। একবার যা ট্র্যাজেডি পরের বার তাই বেল্লিকবাজার। বিস্মরণে যাক সেইসব কথা। এটা নাইনটিন এইট্টি সেভেন।

এই খালের ধারে কত কি উদ্ভিদ, ইঁদুর, বুনো লতা, শামুকখোলা, নোংরা সর, পচা কাথ, কুকুর পচা, মানুষ পচা সুরুয়া। সেই জলে নিমজ্জিত বিরিঞ্চির মাথা। নির্বিকার। দুটি চোখ ঈষৎ খোলা। জলের তলায় নিমীলিত দেখায়। জলের ওপরে আটপেয়ে জলছোঁয়া পোকা সড়াক্ সড়াক্ যায়। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের আলো কয়েক লক্ষ বছর পরে হুমড়ি খেয়ে জলের ওপরে পড়ার আগে রক্তের গন্ধ পেয়ে সজাগ হয়। বিরিঞ্চি, স্রেফ এই নোংরা বদ্ধ পচা জলে যে বিউটি ট্রিটমেন্ট হয় তা কে জানত। কি হ্যান্ডসাম হয়ে উঠেছ গুরু!

বিরিঞ্চি তুমি এগিয়ে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে আছি। বিরিঞ্চি যুগ যুগ জীও। বিরিঞ্চি অমর রহে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই বিরিঞ্চি, এ লড়াই জিততে হবে। হোয়াট

বিরিঞ্চি থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো। থ্রি চিয়ার্স ফর বিরিঞ্চি। হিপ্ হিপ্ হুররে। বিরিঞ্চি জাগো। বিরিঞ্চি গর্জে ওঠো। পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীবিরিঞ্চি, তোমার আরব্ধ কাজ এখনো বাকি পড়ে আছে। মাথা নেই তো হয়েছে কি? বিরিঞ্চি ডার্লিং, সুইট বাসটার্ড। এ তুমারা কেয়া হুয়া বিরিঞ্চি? বিরিঞ্চি, তুমি ফরাসি জানো? ভু পার্লে ফ্রাঁসে? বিরিঞ্চি গুড নাইট। এই শালা বিরিঞ্চির বাচ্চা। ডোন্ট বি নটি বিরিঞ্চি। চেয়ে দ্যাখো কে কে এসেছে তোমাকে নিতে। বিরিঞ্চি, বি এ স্মার্ট, বিরিঞ্চি, স্মার্ট হও। ছিঃ বিরিঞ্চি, সিঁদুর দিও না মুছে। শাঁখা দিও না ভেঙে। বি··· রি··· ঞ্চি! বিরি! ইনস্যাট ওয়ান বি-রিঞ্চি! বিপ্ বিপ্ বিরিঞ্চি! হে বীর বিরিঞ্চি, ওঠো, জাগো, গ্রেট ঢপবাজ বিরিঞ্চিবাবা, ওঠো তো মাল—হে বীর্যবান, হে বীরশ্রেষ্ঠ, হে বিদায়মুখর, বিবাগী বিরিঞ্চি, ঢের হয়েচে, জাগো বাবা।

বিরিঞ্চি নির্বিকার। এই ভালো। মাথা নেই। চিরুনি লাগবে না। সেলুনের খরচও বেঁচে গেল। চিন্তা নেই। ভাবনা নেই। বিরিঞ্চির মা-র যখন সাধ হয়েছিল তখন বিরিঞ্চির মা-র শাশুড়ী বলেছিল পায়েস যখন ফেটে গেছে তখন ছেলে হবে। বিরিঞ্চি হয়েছিল। আজ বিরিঞ্চি নেই। যাই হোক মুণ্ডহীন বিরিঞ্চি ও মাথাহীন বেশ্যার বাজারদর কিন্তু এক নয়। বিরিঞ্চির ঐতিহাসিক ভূমিকা সাঙ্গ হতে পারে কিন্তু তাতে মাথাবিহীন বেশ্যার দরদাম হেরফের করে না।

বিরিঞ্চি যে নেই সেই বার্তা রিমোট-কন্ট্রোলে কিভাবে জানতে পারে সেই বেশ্যা যার মাথা নেই? তার কমিক বোধ অতীব প্রখর। ক্যাসেট রেকর্ডার বাজাতেই খ্যাঁ খ্যাঁ করে সেই গণিকার হাসি সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। পাক খায়। মাথা নেই তো হয়েছে কি? হাসির কমতি পড়ছে? আরামে ঘাটতি পড়েছিল? ক্যাসেট ক্যাসেট হাসি। হাসির হর্‌রা। মাথা নেই তো হয়েছে কি? আজ মাথাবিহীন বেশ্যা বড়োই উৎফুল্ল।

১৯৮৭

টয়

টয়কে একা রেখে মিথিল আর মিমি একসঙ্গে কোথাও অনেকদিন যায়নি। যাওয়ার কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। কিন্তু মিথিলই অফিস থেকে ফোন করে মিমিকে বলল যে মহেন্দ্রর বাড়িতে সন্ধেবেলা তারকোভস্কির 'নস্টালজিয়া' ভিসিআর-এ দেখার খবর। অমিতাদিকে বলে টয়-কে দেখার একটা ব্যবস্থা করতে। একটেরে ছোট্ট তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির ওপরতলাটায় লোক নেই। রোগা বাড়িটাতে একটাই করে ফ্ল্যাট এক এক তলায়। দোতলায় টয়রা। একতলায় অমিতাদি। আর এগোবার আগে একোয়ারিয়ামের ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যাক।

গতবছর মিথিলের অফিসে বেশ ঝামেলা পাকিয়েছিল। মিথিলের ডিভিশনের বস রিটায়ার করলেন। তাঁর জায়গায় নতুন একটা লোক বম্বে থেকে এল। ওখানে কোনো টাটা কনসার্নে ছিল। আর এল তো এল শুরু হল খটাখটি, এটা নিয়ে খুচরো ঝামেলা, ওটা নিয়ে খিট। শুরু হল মিথিলের টেনশন। সেই সময় মিথিল যোগব্যায়াম শুরু করল। প্রাণায়াম, শবাসন। যে ছেলেটা যোগ শেখাতে আসত সেই মিথিলকে বলেছিল বাড়িতে একটা একোয়ারিয়াম আনতে। সে ছিল শ্রীঅরবিন্দ ও মাদারের ভক্ত। মাদারের কোনো লেখায় নাকি আছে একোয়ারিয়ামের মধ্যে মাছ দেখলে মন খুবই শান্ত হয়। কয়েকজন এটা করে বেশ ভালো ফল পেয়েছে। অতএব একধরণের চিকিৎসার প্রয়োজনেই একোয়ারিয়ামের আবির্ভাব। খুব বড় নয়। বেশি মাছ ধরেও না। সোর্ডটেল, গাপ্পি, এঞ্জেল, ব্ল্যাক মলি, গোরামি। পরে এসেছিল ক্যাট ফিশ। কেঁচো রাখা হত বাথরুমে। ফোঁটা ফোঁটা জলের তলায়। অনেক ঝামেলা। তাই ড্রাই ফুড এল। মিথিলের দেখাদেখি টয়ও বাবার মতো টিভি না দেখে একোয়ারিয়াম দেখার নেশায় মেতেছিল। বুক ফেয়ার থেকে মিথিল আর মিমি টয়কে 'মালটিকালারড্ ফিন্‌স' বলে একটা বই কিনে দিয়েছিল। সেই বইটা পড়ে টয় একদিন বলেছিল,

—বাবা, আমাদের মাছের ঘরে ফাইটার নেই কেন?

—ও এনে লাভ নেই। নিজেরাই মারামারি করে মরবে।

—বইটাতে কিন্তু লিখেছে ওরা মেরে ফেলে না, পাখনা ছিঁড়ে দেয়। আবার গজায়।

—তুই পড়েছিস?

—হ্যাঁ। এঞ্জেলের ভালো নাম কী বলো তো?

—কী?

—টেরোফাইলাস এমিকেই।

সেই সন্ধেবেলায় টয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় কী করবে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল মিমি। সাতটায় যেন ভালো ছেলে হয়ে কমপ্ল্যান খেয়ে নেয়। রাতে ফ্রুট কাস্টার্ড। তা ছাড়া টয়-এর জন্য একটা সারপ্রাইজও আসতে পারে। টিভিতে কোনো বাচ্চাদের প্রোগ্রাম নেই। থাকলে ভালো হত। কমপ্ল্যান খেয়ে নিয়ে টয় যেন পড়তে বসে। আটটায় অমিতাদি এসে দেখে যাবে। দারোয়ান-ও খেয়াল রাখবে। তেমন চেনা না হলে দারোয়ানই বলে দেবে পরে আসতে। যদিও কারো আসার কথা নেই। আর মিমিরা তো সোয়া নটার মধ্যে এসে যাবেই। অবশ্য টয় এতই শান্ত, ভদ্র আর চুপচাপ ছেলে যে তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই এটা মিমি আর মিথিল দুজনেই জানত। মিমি বাড়ির সামনে থেকে মিনিবাসে উঠে গেল। টয় বারান্দা থেকে হাত নাড়ল। তখন সোয়া ছটা। চারটে স্টপ পেরোলেই মহেন্দ্রদের বাড়ি।

টয় অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাড়ি গুনল। সেই খেলাটা খেলল। ইচ্ছেমতো গাড়ি আনা। খুব একটা শীত পড়েনি এবার। যদিও সূর্য তাড়াতাড়ি ডুবছে আর আলোর পাশে ধোঁয়া ধোঁয়া। ইচ্ছেমতো গাড়ি আনার খেলাটা টয়-এর তৈরি। টয় ছাড়া এই খেলাটার কথা কেউ জানে না। এইবারে একটা অ্যাম্বাসাডর আসবে। এল। ওয়ান নিল। এইবার মারুতি। তার বদলে এল একটা পুলিশ ভ্যান। ওয়ান অল। এবারেও মারুতি। মারুতি টু টু ওয়ান। সাইকেল টু হুইলার, বাস, মিনি—এদের এই খেলায় ধরা হয় না। ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরেই আলো জ্বলছে। ৪৫—৩৭-এ জিতে টয় যখন কমপ্ল্যান খেতে গেল তখন সাতটা পাঁচ। সোয়া সাতটায় মিথিল-মিমির ফোন। সব ঠিক আছে তো? হ্যাঁ। ভয় করছে না তো? না। পাঁচটা অঙ্কের হোম টাস্কটা শেষ করে রাখলেই হবে। হাতের লেখাটা কাল সকালে করবে টয়। টয় ফোন রেখে দিয়ে অঙ্ক নিয়ে বসল। অঙ্কগুলোর মধ্যে শেষটা ছিল কঠিন আর বড়। অনেকগুলো গুণ-ভাগ। শেষ অঙ্কটার সময়েই দরজায় বেল। অমিতাদি!

—কী করা হচ্ছে টয়বাবু?

—হোম টাস্ক করছি। অঙ্ক।

—এত ভালো ছেলে আমি কখনো দেখিনি। ভয় করছে না তো?

—একটুও না।

অমিতাদি টয়কে চারটে হজমোলা ক্যান্ডি দিয়ে গেলেন। টয় নিজের টেবিলে দুটো রাখল। দুটো রাখল বাবা-মা-র খাটের পাশে বেডসাইডের ওপর। অঙ্কটা শেষ অব্দি হল না। তখন আটটা দশ।

তারপর টয় বাথরুমে গিয়ে হিসি করল। ফ্লাশ টানল। তারপর বাথরুমের পাশের দেওয়ালে, টয়ের হাতের নাগালের বাইরে, যে বাক্সটা লাগানো আছে, সেটা কমোডের ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে খুলল। খুলতেই চমৎকার একটা গন্ধ। ইউ ডি কোলন, আফটারশেভ লোশন সব মিলিয়ে। মিথিল টুরে গেলে একটা ছোট্ট, মিনিয়েচার, অসম্ভব কিউট দেখতে ইমারসান হিটার নিয়ে যায়, দাড়ি কামাবার জন্যে জল গরম করে, সেটা

নামাল।

মিথিল, মিমি ঠিক সাড়ে নটায় বাড়িতে ফিরেছিল। ফিরে দেখেছিল টয় মন দিয়ে টিভি দেখছে। কেবল টিভিতে তখন অস্ট্রেলিয়াতে পিংক ফ্লয়েডের একটা লাইভ প্রোগ্রাম। সাইকেডেলিক আলো। ধোঁয়া। স্লো মোশনে বড় বড় চুলের ঢেউ। নীল গিটারের তারে বিদ্যুতের মতো চড়া আলোর ঝলক। ওরা টয়ের জন্য আইসক্রিম এনেছিল। টয় তাই খাবার পরে ফ্রুট কাস্টার্ড খেল না। টয় ঘুমোতে চলে গেল। মিমিও টয়ের পাশে শুয়ে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মিথিলের ঘুম আসেনি। নস্টালজিয়াতে মোমবাতির আলোগুলো তাকে ঘিরে যেন জ্বলছে। পরে একটা মোমবাতির আগুন বাঁচাবার জন্যে···মিথিল দেখল তার মাথায় আবার সেই অস্থিরতাটা হচ্ছে। সিগারেট নিয়ে একোয়ারিয়ামের সামনে বসা যায়!

একোয়ারিয়ামের আলো জ্বলছে। ওপরে টিনের ছোট্ট ঢাকাটা সরিয়ে একটা পেন্সিল আড়াআড়ি রাখা। তার থেকে ঝুলছে ছোট্ট ইমারসান হিটার। মাছগুলো মরে গেছে। ইমারসান হিটারটা জ্বলছিল বলে জলের মধ্যে একটা অদৃশ্য তরঙ্গ সৃষ্টি করে গরমজলের ওপরে ওঠা ও ঠাণ্ডা জলের নীচে নামা চলেছে। সেই অদৃশ্য স্রোতের মধ্যে মরা মাছগুলো কখনো উলটে, কখনো কাত হয়ে সরে সরে যাচ্ছে! জলটা বেশ গরম। ডুবুরি পুতুলের মুখ ফাঁক হয়ে রুপোলি বুদবুদ উঠছে। ইমারসান হিটারের গা থেকেও ছোট ছোট বুদবুদ উঠছে।

পরদিন টয় স্কুলে যায়নি। টয়কে নিয়ে তার বাবা-মা সাইকিয়াট্রিস্ট দিব্যেন্দু মুখার্জির কাছে যায়। উনি মিমির মামার চেনা। মিথিল ও মিমি বাইরে বসেছিল। ডঃ মুখার্জি প্রায় ঘণ্টাখানেক টয়কে নিয়ে ভিতরে ছিলেন। পরে যখন ডঃ মুখার্জির সঙ্গে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল তখন টয়ের হাতে আমুল চকলেট আর দুজনের মুখেই হাসি।

—মিঃ টয়, তুমি বসে এই ছবির বইটা দেখতে থাকো, আমি একটু বাবা-মা-র সঙ্গে কথা বলে নিই।

টয় ঘাড় নাড়ল। ডঃ মুখার্জি বললেন, ওফ্ কত গল্প যে হল আমাদের।

ভেতরে ডঃ মুখার্জি মিথিল ও মিমিকে বলেছিলেন।

—ঘটনাটা আপনাদের কাছে যতটা ম্যাকাবার মনে হচ্ছে আমার মতে সেটা খুব সিরিয়াস কিছু নয়। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে, যেটাতে বিশেষভাবে ইম্প্রেসড সেটা হল, আপনাদের ছেলের মধ্যে একেবারে অ্যাগ্রেশন নেই। এত মিষ্টি, ঠাণ্ডা মন···আপনাদের আমি বলব ব্যাপারটা ইগনোর করতে। এটা কোনো প্রব্লেম নয়। হি ইজ পারফেক্টলি নরম্যাল। সর্ট অফ কিউরিওসিটি···অলমোস্ট সায়েন্টিফিক···।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, একটি বিদেশী পত্রিকাতেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কয়েকজন হত্যাপরাধী শিশুকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েছিল মিথিল। ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণ নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। তার মধ্যে জনৈক ফরাসি মনস্তত্ত্ববিদ বলেছিলেন যে রকম ঠাণ্ডা মাথায়, নির্লিপ্তভাবে এরা নিজেদের অপরাধের বর্ণনা দিয়েছে তাতে মনে হয় যে এর মধ্যে কোথাও একটা বিজ্ঞানমনস্কতার ব্যাপারও রয়েছে। মিথিল মিমিকেও পড়াল।

টয়কে নিয়ে তার বাবা-মা-র দুশ্চিন্তা আর থাকল না।

১৯৯৪

৪+১

এক

বৃষ্টি পড়েছিল সেদিন সারাদিন ধরে। যদিও জল জমার মতো জোরে নয়। ঠাণ্ডা হাওয়া। দিনের আলো ছিল কম। ট্রামের চালক খুব একটা সতর্ক না থাকলেও ব্রেক সে ঠিকই করেছিল। আর ট্রামটা তখন সদ্য মোড় ঘুরেছে বলে খুব একটা জোরেও চলছিল না। ঘষটে লাইন কামড়ে থেমে যাওয়ার আগেই ধাক্কাটা লেগে যায়। সামনের দুজনেরই অল্প চোট লাগে। পেছনের দুজনের লাগেনি। একজনের কপাল ফেটে গিয়েছিল। অন্যজনের নাকে লাগে। মাড়ি ও দাঁতেও। দুজনেরই রক্ত পড়ছিল। যারা দৌড়ে এসেছিল তাদের কাছে শোনা। ওদের চারজন বাদে আর একজন যে ছিল সে মৃত। খাটের সঙ্গে কালো প্লাস্টিক জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সচরাচর এরকম মৃতদের খাটে ধূপকাঠির গোছা, ফুল এসব থাকে। সেসব কিছুই ছিল না। পরে জানা গিয়েছিল যে মৃতদেহটির মাথার কাছে একটি ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটা ভাঙা কালো চশমা, কয়েক টুকরো চকখড়ি, কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ ও আধখানা থিন এরারুট বিস্কুট ছিল। আশা করা গিয়েছিল যে ছেঁড়া কাগজের মধ্যে কোনো হদিশ হয়তো পাওয়া যাবে। যায়নি। কাগজে অর্থহীন কিছু আঁকিবুকি ছিল। কষ্ট কল্পনাতে হয়তো মানে একটা বের করা যায় কিন্তু তারও কোনো মানে হয় না।

সবচেয়ে ভয় পেয়েছিল ট্রামচালক। ভয় না পাওয়ারও কিছু নেই। কারণ মোড়টা ঘোরার পরেই সে দেখেছিল যে মুখোমুখি ওরা এগিয়ে আসছে। মৃতদেহ নিয়ে ওই চারজন। সরাসরি ট্রামের দিকে। হতভম্ব হয়ে সে তার খাঁচার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। রাস্তায় বেশি লোক ছিল না। তবুও ছোটখাটো একটা ভিড় জমে যায়। তারপর সকলেই ভয় পেয়ে যায়। ফোন করা হয়। পুলিশ আসে।

ট্রামের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে চারজন শববাহক যে দাঁড়িয়ে যায় তারপর তারা আর নড়েনি। পুলিশ এসে নিয়ে যাওয়া অবধি ট্রামকে রাস্তা ছাড়েনি। সামনের দুজনের

মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছিল। লোকে ওদের বলেছিল সরে যেতে। কয়েকজন উৎসাহী যুবক ভেবেছিল ওই চারজন এমনই নেশা করে আছে যে কোনো ওজরই তাদের কানে ঢুকছে না। একে মেঘলা, বৃষ্টি, আবছা তার ওপরে শহরের এই এলাকাটায় বাড়িগুলো পুরোনো দিনের হলেও বেশ উঁচু যদিও তলায় তাদের আলো ঝলমলে নতুন দোকান আছে। বিকেল গড়ালেই এখানে ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে দিন ছায়া ছিল তার ঢের বেশি। বুদ্ধিমান নাগরিক, যারা খতিয়ে দেখে কিসের পেছনে কি তা আঁচ করতে পারে, তারা বলেছিল এটা একটা কেরামতি বা স্টান্ট। ওপরে যে লোকটার মৃতদেহ সে নাকি জ্যান্ত। এরাও এক একজন অভিনেতা। সবটাই এক ছক। হতে পারে কোনো নাটকের দলের বেয়াড়া বিজ্ঞাপন বা উটকো রসিকদের বোকা রগড়। পুলিশ, মানে প্রথমে যারা এসেছিল তারাও ভেবেছিল তেমনই একটা কিছু। অথচ দোলের সময় মড়া সাজিয়ে যে চ্যাংড়ারা মজা পায় এদের সেরকম আদল নয়। হেরোইন খেয়ে বুঁদ বা ওরকম কিছু হবে। সাধারণ লোক, সাধারণ পুলিশ এইসবই ভাবে। এদের ওপরে ভাবে অসাধারণ লোক, অসাধারণ পুলিশ। নতুন চাকরি পাওয়া যুবক আই পি এস অফিসারটিও তাই ভেবেছিল। গণ্ডগোল যে খুব একটা জমেছিল এমন নয়। পরপর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একটা ভিড়, একটা জটলা, নির্বাক, নিরুত্তর চারজন শববাহক এবং কালো প্লাস্টিকের চাদর জড়ানো দড়িবাঁধা একটি মৃতদেহ, শীর্ণ একটি প্রৌঢ় মানুষের যার মাথার কাছে নোংরা কাপড়ে জড়ানো ছিল চশমার একটা ফাটা কালো কাচ, ডাটি সুতোয় বাঁধা কালো চশমার ফ্রেম, বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ক্যাম্পে যেরকম দেওয়া হয়, কয়েক টুকরো বলতে যখন আর লেখা যায় না সেরকম কয়েকটা চকখড়ির অবশেষ, কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ যাতে যোগচিহ্ন, ফুটকি ও '৫' লেখা ছিল বলে দাবি করা হয়েছে কিন্তু এ হল কয়েকটি অস্পষ্ট ও আনাড়ি পেন্সিলের দাগ নিয়ে গবেষণার ফল এবং এবড়োখেবড়োভাবে খাওয়া আধভেজা আধখানা থিন এরারুট বিস্কুট যা কে খেয়েছিল জানা যায়নি, অন্তত মৃত যে সে তো খায়ইনি কারণ ব্যবচ্ছেদের পর তেমন কিছু জানা যায়নি। পরপর কয়েকটা ট্রাম দাঁড়িয়ে গেলে মাছির মতোই উড়ে আসা ন্যাংটো, গায় ঘা ভিকিরির বাচ্চারা ওঠানামার খেলা করে। যাই হোক, সেই তরুণ আই পি এস অফিসারটি ঠাণ্ডা মাথায় আদেশ করলেন ওই চারজন শববাহককে শবসহ গ্রেপ্তার করতে। সবুজ বা নীল চ্যানেলের মাধ্যমে এমনও ব্যবস্থা করলেন যাতে এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃতদেহটিকে মৃতদেহ অবিকৃত রাখার কোনো শবাগারে পাঠিয়ে বরফ দিয়ে রাখা হয়। এবং মৃতদেহ ও বরফ ঘিরে বালির বস্তা। মৃতদেহটি বুবি ট্র্যাপ হতে পারে। ওই চারজন শববাহককে নিয়ে যাওয়া হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। হাতকড়া পরিয়ে। পুলিশের প্রতিবেদনে জানা যায় যে শববাহী খাটের চারটি পায়া তারা যেমন কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল হাতে হাতকড়া পরাবার সময় তাদের হাতে সেই বেপরোয়াভাব ছিল না। ওরা চারজনেই সারাক্ষণ চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। ওদের নাকি চোখের পলক পড়েনি। জিজ্ঞাসাবাদের সময়েও না।

আই পি এস অফিসারটি ভুল করেননি। বোম্বাই বিস্ফোরণ, কলকাতা বিস্ফোরণ, দক্ষিণ ভারতে বিস্ফোরণ, পাক মদতে আতঙ্কবাদ—এই ভয়াবহ সময়ে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য, কেউই কোনো ঝুঁকি নিতে পারে না। লেনিন পড়ে তিনি জানেন যে অতিবাম ও অতি দক্ষিণ হাত মেলায়। এই হাভাতে, চোয়াড়ে, পোড়খাওয়া চেহারার চারটি মানুষ যে কি তা জানা দরকার। 'কারলোস' ধরা পড়েছে ঠিকই। তাতে কি? টাইগার মেমন

কোথায়? বহুতল বাড়ির জানলা থেকে উড়ে বেরোনো সেই চিত্র তারকার রহস্য! নার্গিসের ছেলে! আর ডি এক্স। এ কে-৫৬। ড্রাগ। ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পাচার। ভারতের পরমাণু বোমা আছে না নেই? থাকুক আর না থাকুক এ অবস্থায় কোনো অসংগতিই উপেক্ষা করা যায় না। হয়ওনি। বাস্তব জীবনটা তো আর 'রোজা' বা '১৯৪২—একটি প্রেমের গল্প' নয়।

দুই

জিজ্ঞাসাবাদের পর্বের আগে মৃতদেহটি নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যা জানা গেল তা হল মৃতদেহটি এক শীর্ণ, বয়স্ক মানুষের যার মৃত হয়ে যাওয়া দেহটির মধ্যে দেহের মধ্যে যা যা থাকে সেগুলি 'অপমানিত' অবস্থায় থাকা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। দেহের কোনো অঙ্গ চোট পেলে বা ব্যাধিতে দুর্বল হলে ভালো ডাক্তাররা বলেন 'ইনসাল্ট'। যেমন ধরা যায় যার দুবার ন্যাবা বা কামলা হয়েছে তার লিভার দুবার 'ইনসাল্ট' সহ্য করে বলে ডাক্তাররা ভালো হলে বলে থাকেন। মৃত যে দেহটি খাটের ওপরে কালো প্লাস্টিকে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল সেই মৃতদেহটির বিভিন্ন অঙ্গ যেমন যকৃত, বৃক্ক, মূত্রাশয়, পাকস্থলী, শিশ্ন, অক্ষি, অণ্ডকোষ সবই দেখা গেল 'ইনস্াল্ট' সহ্য করেছে একাধিকবার। অধুনা এমন বিষয় নিয়ে মার্কিন দেশে গবেষণালব্ধ ফল পাওয়া গেছে যে ধর্ম, কাব্য, প্রেম, হিংসা, ন্যায়, চুরি, ক্ষুধা, যৌনতা, বউ-বোধ, সন্তান সংজ্ঞা, ধর্ষণের ইচ্ছা, মৌনতা, সংগীতলিপ্সা এসবই মস্তিষ্কের বা তার মধ্যে যে অর্থাৎ করোটির প্রকোষ্ঠে যে ঘিলু থাকে তার এক এক অংশের গুণাবলী। সেই জ্ঞান অনুযায়ী ওই শীর্ণ মৃতদেহটির মস্তিষ্ক নিয়ে যদিও এখনো পর্যাপ্ত ঘাঁটাঘাঁটি হয়নি কিন্তু আশার কথা এই যে অতীব শীতল হিমঘরে এখনো মৃত ওই দেহটিকে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচে। অর্থাৎ মৃতদেহটি গবেষণার জন্য অপেক্ষমাণ।

চারজন শববাহকের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছিল বেশ ভদ্রভাবে। তুতিয়ে পাতিয়ে কথা আদায়ের জন্য। কথার মারপ্যাঁচে এইভাবে যাকে জেরা করা হয় যে ফাঁপরের পর ফাঁপরে পড়ে। কিন্তু এদের বেলায় সেভাবে লাভ হয়নি কারণ তারা চারজন কোনো কথা বলেনি। সবাই, মানে জিজ্ঞাসাবাদ যারা করে থাকে তাদের সবাই কথার মারপ্যাঁচে রপ্ত নয়। বরং তারা মারধোর, ভয় দেখানো এবং কখনো কখনো এসপার ওসপার ঘটিয়ে ফেলে থাকে। কেউ বলে বুঝেশুঝেই ঘটানো হয়। আবার কেউ বলে রোখের মাথায় ঘটে যায়। যাই হোক, এই দ্বিতীয় ধরণের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছিল সেই দুজনকে দিয়ে যাদের মুখে ট্রামের ধাক্কার চোট ছিল না। অর্থাৎ যে দুজন খাটের পেছনের দুটো পায়া ধরে কাঁধ দিয়েছিল। চড়চাপড়ে কাজ হল না। ঝুলিয়ে রেখে লাথি মারতেও নয়। এই সময় তরুণ সেই আই পি এস হস্তক্ষেপ না করলে হয়তো কিছু একটা খতরনাক ঘটেই যেত। তিনি জিজ্ঞাসাবাদের দ্বিতীয় ধরণটি বন্ধ করলেন। অল্পবিস্তর চিকিৎসায় দুচারদিনেই ওই দুজনে আবার উঠে বসল। তারপর একসঙ্গে চারজনকে পাঠানো হল ডাক্তারদের কাছে।

তিন

চোখে আলো ফেলা বা পায়ের তলায় বা হাঁটুতে টুংটাং বাড়ি মারা জাতীয় মামুলি ব্যাপারের বর্ণনায় গিয়ে লাভ নেই। চারজনেরই মাথায় খুলির মধ্যে একাধিক ইলেকট্রোড

ঢোকানো হল। এখানে বলে নেওয়া দরকার যে পাঠক যেন এ ব্যাপারটি কোনোমতেই জিজ্ঞাসাবাদের তৃতীয় এক ধরণ বলে না মনে করেন। বিজ্ঞান অত্যাচার নয় যদিও অত্যাচারে বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়। মনিটরিং মেশিনে নানা রকম আলোরেখা ইত্যাদি দেখে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা একটি সভায় মিলিত হলেন। এরপর তাঁরা যে ইংরেজিতে লেখা বিশদ রিপোর্টটি পুলিশের বড় কর্তাকে দেন এবং তিনি যার একটি জেরক্স কপি নিজের কাছে রেখে মূলটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে দেন এবং সেখানে আবার যার জেরক্স কপি রেখে মূলটিকে উচ্চতর পদাধিকারীর কাছে দেওয়া হয় তার মধ্যে No evoked potential in auditory/visual cortex on peripheral sensory stimulation'.... অথবা 'sensory aphasia'...:. বা 'sensorineural deficit ইত্যাদি খটোমটো অনেক কথা আছে যার সহজ সরল মানে হল ওই চারজন শববাহকই অন্ধ, কালা ও বোবা। কেউ অন্ধ এবং কালা হলে সে বোবা হতে বাধ্য। এবং কোনো লোকের যদি এরকম হয় তাহলে তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়। করা যায়ওনি। খেতে দিলে মানে হাতে বাটি বা থালা ধরিয়ে দিলে এরা কিন্তু খায়। গন্ধ পায় কিনা বোঝা যায়নি। কখনোই কোনো ভাবের পরিবর্তন নেই। চোখের পলক পড়ে না। শোনে না। দেখে না। কিছু বলে না। কখনো শুনবেও না ও দেখবেও না। বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। এদের সম্বন্ধে কখনোই কিছু জানার সম্ভাবনা নেই। এদের একটি জায়গায় আটক করে রাখা হয়েছে। ওদিকে জেরক্স কপি রেখে মূলটি পরবর্তী ওপরওয়ালার কাছে চলেছে। কিন্তু সেটাও তো একসময় রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে থেমে যাবে। চারজন মূক, বধির ও অন্ধ শববাহকের সম্বন্ধে তাতেও কিছু জানতে পারার সম্ভাবনা নেই।

চার

মৃতদেহটি অত্যাধুনিক এক হিমঘরে রাখা আছে। এর থেকে অধিকতর অত্যাধুনিক হিমঘরে কতিপয় মার্কিন বিলিয়নেয়ার তাঁদের মৃতদেহ অবিকৃত রেখেছেন। তাঁরা এই আশায় এটা করেছেন বিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে এমন সীমান্ত অতিক্রম করবে যখন তাঁদের আবার বাঁচিয়ে তোলা যাবে। কয়েকশো বছর পরে বেঁচে উঠে অনেকগুলি প্রজন্ম টপকে তাঁরা আবার ব্যবসাপতি করবেন, আমোদপ্রমোদ করবেন। তাঁদের এই ধরণের ভাবনাচিন্তা ও বাসনা আমাদের এখানে সংরক্ষিত মৃত ব্যক্তিটির থাকার কথা নয়। অবশ্য পরে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে হয়তো রহস্যের সমাধান ঘটতে পারে। তরুণ আই পি এস অফিসারটি অবশ্য এই লাইনে কিছু ভাবেননি।

ওদিকে চারজন সম্বন্ধে তো আগেই বলা হয়েছে যে তাদের আটক রাখা হয়েছে। লোহার মোটা শিক বসানো দরজা। তালাবন্ধ। দিনে রাতে দফায় দফায় পাহারা। দেওয়ালের ওপরে জাল দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটা চৌখুপি। সেখান দিয়ে কখনো সূর্যের আলো, কখনো চাঁদের আভা তেরচা হয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারপর সূর্য বা চাঁদ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো মায়াবী বেড়ালের মতো একসময় পালিয়ে যায়। ওরা চুপ করে চারজন বসে থাকে। কখনো কখনো চৌখুপির জালে কোনো দলছুট চড়াই এসে ঠোকরায়। কখনো সামান্য হাওয়া ঢুকে ওদের দেখে থমকে যায়। ওদের চোখের পলক পড়ে না। ওরা চারজন মেঝের ওপরে চুপ করে বসে থাকে। এখানে পাহারা দেওয়ার কাজটি সান্ত্রীদের পছন্দ নয়। বিশেষত রাতে তো নয়ই। তখন নাকি ওদের কেউ কেউ ফিসফিস কথা শুনেছে বা হাসির শব্দ পেয়েছে বলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি

করেছে। সেই তরুণ আই পি এস অফিসার এখনো মাঝেমধ্যে আসেন। তবে আর বেশিদিন তাঁকে তরুণ বলা সঙ্গত হবে না কারণ সময় কেটে যাচ্ছে। শুধু ওই চারজন শববাহকের ঘরের ভেতরে মনে হয় সময় থমকে আছে।

ওই মৃতদেহটি কার? তার নাম কি? তার কেউ আছে? কিভাবে সে মারা গিয়েছিল? ওই চারজন শববাহকের পরিচয় কি? তারা সেদিন কোন শ্মশানে যাচ্ছিল? কিভাবে পৌঁছত তারা? এরকম একটা ঘটনা ঘটল কি করে?

কেউ যদি এ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানেন তাহলে তাঁর প্রতি অনুরোধ যে দয়া করে এগিয়ে এসে কর্তৃপক্ষকে জানান। কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করে আছেন।

১৯৯৫

ফ্যাতাড়ু

ব্ল্যাকে মাল খেলে কখনো হলুদ হ্যালোজেনের জোনে যেও না

সে এরফানই হোক বা মণ্ডলই হোক, ব্ল্যাকের ঠেক যারই হোক না কেন, ক্বচিৎ কখনো এমন হয়ে যায় যে কোনো কন্ট্রোল থাকে না। প্লেন ড্রেসে এক মাতাল পুলিশ হয়তো লিঃ লিঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল। অমনি যেখানে যত মাতাল আছে তারাও ওই অসভ্য চিৎকার শুরু করবে। যে লোকটা এক কোণে খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে আচমকা চোখ খুলে চোখের সামনে যে পানপরাগ দিয়ে চাট করছিল তাকে দুম করে ঝেড়ে দিল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল কিচায়েন। তাই বেস্ট পলিসি হল ডি এস বা ডিরেক্টর স্পেশালের। ওর অ্যাটাচি কেসের দুপাশে দুই খোপে ওই দুই নামপদবির আদ্যক্ষর শোভা পাচ্ছে। ডি এস। কালো। কুৎকুতে কোলা ব্যাঙ। টেরেলিনের শার্ট পরা। দুই বোতামের ফাঁক দিয়ে মহাপ্রভুর ছবি বসানো লকেটটি বেরিয়ে। অ্যাটাচি কেসের মধ্যে অনেক শেয়ারের ফর্ম। বিলিতি মালের নাম লেখা ডট পেন। নোংরা চিরুনি যাতে অনেক লোকের মাথার ময়লা গোড়ায় ফসিল হয়ে আছে। এক বৃদ্ধার ফটো। কামপোজ ট্যাবলেট। মেট্রো রেলের টিকিট। একটি কেনা ডায়রি। এই বছরেরই। রাতটা ছিল বেশ ঘেমো। আর সরগরম। ডি এস-এর পলিসি হল দুম্ দুম্ করে একটা পাঁইট চার্জ করে বেরিয়ে পড়া। কিন্তু সেদিন ডি এস যে লোকটার খপ্পরে পড়ে গেল সে ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরা, ফরশা, রোগা, কলপ করা কালো কুচকুচে ঘাড় ঢাকা চুল, টিকোলো নাক, কিন্তু একটাও দাঁত নেই।

লোকটার নাম মদন। সে মাড়ি মেলে হাসল। তারপর ডি এস-এর পেটে সরু আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে বলল,

—এই যে এত মাতাল দেকচেন না, সব জানবেন গিদ্ধড়। বাড়ি গেলেই বউয়ের লাতি খাবে। একে কী বলে জানেন তো—সঙ্গদোষে বঙ্গদোষ। আমি এই জন্যে বাঙালিদের হেট করি। সব শালা হল বউয়ের এঁটুলি। বউগুলোও চান্স পেলেই পালাবে। ডি এস ঘাবড়ে গেল। তার কারণ ডি এস-এর বউ পালিয়েছে। পিয়ারলেসের এক

সাকসেসফুল এজেন্টের সঙ্গে। বারুইপুরের মেয়ে। ডি এস মদনকে বলল,

—আপনি কি ডিটেক্‌টিভ?

—কী মনে হচ্ছে? আরে আসল কথা হল—ওপারে যেও না ভাই ফটিং টিংয়ের ভয়। তা, বাঙালি শুনল না। ওপারে গেল। এরপরই তো তন্দুর, কুমির··· ডি এস আজ নয় কাল তোমাকেও ওই কেসে জড়াতে হবে। এই বলে মদন পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুপাটি দাঁত বের করল। হাতের পাঁটের বোতলটা কাত করে—অল্প মালে ধুয়ে নিয়ে খপ্ খপ্ করে পরে নিল। হেসে বলল,

—ও নিয়ে ভেব না। বউ পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও বেড়েছিল। এতক্ষণ তোমাকে যা বললাম সবটাই ঢপ। স্রেফ তোমার কোলে ঝোল টেনে তোমার মন কাড়ার জন্যে। ধান্দা একটা পাঁইট খাব। পকেটে পয়সা নেই। কিনবে?

ডি এস কিনল। মদনই বেশিটা খেল।

—টাকা টাকা করেই মরলে। এই যে শালা মণ্ডল, সাত বছর জেলের ঘানি টেনে এখন এই ব্ল্যাকের ঠেক খুলেছে ব্যাটার কি টাকা কম? মেয়েকে কনভেন্টে পড়াচ্ছে। কিন্তু খুঁজে পেতে দেখ, সব সময় মন ভার।

—কেন?

—সন্দেহ। বউকে নিয়ে ঘোর সন্দেহ। ওকে আবার বলতে যেও না যেন।

—না। না।

—শনিবার টিভি-তে ইংরিজি সিনেমাটা দেখেছিলে?

—না তো।

—তা ভালো জিনিশ দেখতে যাবে কেন? বইটা ছিল হেভি ভয়ের। এক পাল উড়ুক্কু মাছ! উড়ে উড়ে লোক ধরছে আর গলা কামড়ে মেরে ফেলছে।

—ভ্যামপায়ার।

—না, না। ভ্যামপায়ার তো হল গিয়ে বাদুড়। এ হল মাছ। একটা ডোবা জাহাজের খোলের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে লোক মারতে বেরোয়।

—উড়ুক্কু মাছ!

—হবে হাঙর বা কামটের জাতের। যাই হোক বইটা খুব ভয়ের। চল বেরিয়ে পড়ি। এরপর হাওয়া লাগাতে হয়। আমার নাম মদন, জান তো?

—জানি।

—কী করে?

—মণ্ডল ডাকছিল, শুনলাম।

ডি এস আর মদন ঠেকের সামনে উঁচুনিচু অন্ধকার জমিটা টপকায়। পাশে গ্যারেজ। একটাতে গাড়ির খোপের মধ্যে মোমবাতি জ্বেলে তাস খেলা হচ্ছে। হাতে বোতলভরা থলি ঝুলিয়ে সাইকেলে করে একটা ন্যাড়া লোক এল। একটা স্কুটার দাঁড়িয়েছিল।

ডি এস হোঁচট খেল। মদন বলল,

—সামলে। সামনের বছর ভোট হচ্ছে। ভোটে কংগ্রেস ভোগে যাবে। সেন্টারে ঝালমুড়ি গভরমেন্ট হবে। তখন তোমার পোয়াবারো।

—মানে?

—কথা বলতে বলতে তোমার ফোরহেডটা স্টাডি করছিলাম। তখন দেখবে ধুন ধামাকার বাজার সাটাসাট চড়বে।

—কী?

—শেয়ারের দাম। এই সময় কিছু হামাগুড়ি শেয়ার ধরে রেখ। জনক টারবো, রিলায়েন্স পেট্রল, বৃন্দাবন একোয়া—দেখবে কী হয়।

—লাস্ট ধরেছিলাম ডি সি এম টয়োটার একশোটা।

—সত্তর, বাহাত্তর চলছে। তবে উঠবে। এখন ছেড় না।

—তুমি তো দেখছি শেয়ার ভালো বোঝ। কেন নাকি?

—ধুস, পয়সা কোথায় যে কিনব। আর পয়সার আমার দরকারও নেই। যে কটা দিন আছি ফ্যাতাড়ু হয়েই থাকব।

—কী হয়ে থাকবে?

—ফ্যাতাড়ু।

—সে আবার কী?

—সে খুব মজার। এই যে আমি তোমার ফোরহেডটা স্টাডি করলাম, তুমি কিন্তু আমারটা চেষ্টা করলেও পারবে না।

—জানলেও পারব না? ধরো যদি কিরো-র বই পড়ে ফেলি!

—তাহলেও পারবে না। ফ্যাতাড়ুদের ওপরে কোনো প্ল্যানেটের কোনো ইনফ্লুয়েন্স থাকে না।

—ফ্যাতাড়ুরা তাহলে কী?

—ঠিক কী তা বলতে পারব না। তবে ফ্যাতাড়ুরা হল খুব স্পেশাল। বুঝলে? ইতিহাসে দেখবে কত মহাপুরুষ মানুষকে নতুন করে বানাবার জন্যে কত ফন্দি বাতলেছে। আমার তো মনে হয় অনেক ঘেঁটে ঘুঁটে শেষমেষ এই ফ্যাতাড়ু তৈরি হয়েছে।

ডি এস ও মদন টলতে টলতে মোড়ের দিকে এগোয়। মোড় হলদে হ্যালোজেনের আলোয় ফট-ফট করছে। চৌদিক শুনশান, সান্নাটা। রাস্তার ওপারে একের পর এক অন্ধকার বাস ঘুমোচ্ছে। একটা লজ্‌ঝড়ে পুলিশ ভ্যান চলে গেল। একে তো ব্ল্যাকে মাল খাওয়া। তার ওপরে জগৎজোড়া হলুদ হ্যালোজোনের জোন! ডি এস ফুরফুরে হাওয়ায় শান্ত হয়ে অ্যাটাচি কেসটা দুপায়ের ফাঁকে ধরে হলুদ হ্যালোজেনের আলোর ধাতব স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। আধ মিনিটও কাটেনি। হবি তো হ··

ফ্যাঁৎ ফাঁৎ সাঁই সাঁই

ডি এস শুনতে পেল কানে কানে কেউ তাকে বলছে—ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই, ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই, ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ···। চোখ খুলতেই ডি এস দেখল হলদে হ্যালোজেনের আলোগুলো চিড়িক চিড়িক করে ঘুরপাক খাচ্ছে, পাশে মদন নেই, সারা শরীরে পোকার পাখা গজাবার অবিমৃশ্য আনন্দ, রোমকূপে রোমকূপে পালানো বউয়ের আর্তচুম্বন, অন্যদিকে মহাকাশ থেকে গ্যাগারিনের বালকসুলভ মুখের নিষ্পাপ হাসি, অমনি ওপরের দিকে তাকিয়ে ডি এস দেখল···

···চৌকোটে হলদে হ্যালোজেন আলোর পাশে উড়ন্ত মদন আকাশে থেমে আছে। আস্তে আস্তে হাত নাড়ছে আকাশে এক জায়গায় স্থিতু থাকার জন্যে। দুপাটি নকল দাঁতের ওপরে হলুদ হ্যালোজেন সোনালি আভা তৈরি করছে।

—মদন।

—তোমাকে বলেছিলাম না যে ফ্যাতাড়ুদের বেলায় কোনো হিশেব চলে না। এসো। উঠে এসো।

—কী করে?

ডি এস ডান হাতে অ্যাটাচি নিয়ে ঝটপট করে উড়তে চেষ্টা করে। ঘেমে যায়।

—ও রকম করে নয়। ওপর নীচে হাত নামাও ওঠাও।

এই রকম?

—হ্যাঁ। আর বল···

—কী বলব?

—ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই··· ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই···

মদনের ফিনফিনে পাঞ্জাবি ইস্তিরি করা বলে ঠেকছে। ডি এস বলতে থাকে।

—ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই··· ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ··· প্রথমে ডি এস বুঝতেই পারেনি যে সে উড়তে শুরু করেছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ফুটপাথ থেকে হাত খানেক ওপরে সে ভাসছে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ডি এস। ফলে একবার ধপ্ করে পড়েও গেল। ওপর থেকে মদন ধাঁতানি দেয়,

—যেই ড্যাঙা থেকে ঠ্যাংদুটো উঠল অমনি মন্তর বলা ছেড়ে দিল। তেঢ্যামনা কোথাকার। আরো ওপর থেকে পড়লে ভালো হত। বল্, মন্তর বল্।

ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই··· ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই··· এবারে ডি এস স্বচ্ছন্দে উঠে আসে। মদনের পাশে এসে ফড়ফড় করে উড়তে থাকে। একটা রোঁয়াওঠা ঘেয়ো বাদুড় ওদের দুপাক মেরে দেখে যায়। হলদে হ্যালোজেনের থেকে দূরে বসে থাকা প্যাঁচারা ডেকে ওঠে।

—প্র্যাকটিস হয়ে গেলে আর বলতে হবে না। তখন যেই দেখবে তলার দিকে টানছে তখন মনে মনে গুনগুন করলেই চলবে।

—সে তো বুঝলাম কিন্তু নামব কী করে?

—ন্যাকামি হচ্ছে! নামব কী করে? ফ্যাতাড়ুদের খাতায় নাম একবার যখন পাকাপাকি উঠেছে তখন ওঠানামা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। নামার দরকার হলে আপসে লাশ নেমে আসবে।

—লাশ?

—ওই হল। বডি, বডি। চল তো, গঙ্গার হাওয়া ছেড়েছে। নতুন পুলটা মেরে আসি।

ডি এস আর মদন আরো ওপরে উঠে যায়। হঠাৎ মেঘ ফুঁড়ে চাঁদমুখ বেরোল।

ওই যে নতুন পুলের আলো। যে সে আলো নয়, ফিলিপস কোম্পানি জ্বালিয়েছে। চল··· চল··· তলায় বাড়ি, রাস্তা পরপর সরতে থাকে। মাঝেমধ্যে তলায় খোপ খোপ অন্ধকার—মাঠ, গাছ। ডি এস ওড়ার মজা পেয়ে গেছে।

—ভাগ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফ্যাতাড়ু হতে পারলুম।

—তা পারলে। এবারে ওই যে তেতলা বাড়িটা দেখছ না, ওর ছাদে আমরা ল্যান্ড করব।

—কেন?

—বিড়ি খাব। ছাদে ওই যে বাটি অ্যান্টেনা বসিয়েছে ওর তারগুলো ছিঁড়ব। মেরে মেরে ভাঙব?

—অ্যান্টেনা কী দোষ করল?

—তোমার এত এটা কি, ওটা কেন—এত আম্বা কিসের হে? যা করতে বলছি কর।

ওই তল্লাটে যারা কেবল্ টিভি দেখছিল কোনো অজানা কারণে তাদের হঠাৎ পরদা থেকে ছবি চলে গেল। স্থানীয় কেবল অপারেটরের বাড়ি ফোন গেল। তারা তেতলা বাড়ির ছাদে উঠে টর্চ মেরে দেখল তার ছেঁড়া, থান ইট দিয়ে ঠুকে ঠুকে অ্যান্টেনা ড্যামেজ করা হয়েছে, অ্যান্টেনার মধ্যে পোড়া বিড়ি এবং সর্বত্র বাংলা মাল মেশানো পেচ্ছাপের বিকট গন্ধ। ওরা বুঝতে পারল যে রেন ওয়াটার পাইপ বেয়ে চোর উঠেছিল। মালটা এত ভারী আর শক্ত করে সিমেন্ট গেঁথে বসানো যে খুলতে পারেনি।

—তোমাকে দিয়ে হাতেখড়ি দেওয়ালাম। মাথায় ঢুকেছে?

—ঢুকেছে।

—কী ঢুকেছে?

—ফ্যাতাড়ুদের হাতেখড়ি মানে ওই ভাঙচুর, ছেঁড়াছেঁড়ি, হিসু করা।

—বাঃ এই তো বুদ্ধি খুলেছে। ভালো রাতে ফ্যাতাড়ু হলে, একথা আমি বলব।

—কেন?

—চল না। দেখতে পাবে। ফ্যাতাড়ুদের আজ বড় প্রোগ্রাম আছে।

—মানে? তুমি আমি ছাড়াও ফ্যাতাড়ু আছে নাকি?

—আছে মানে কি? পালে পালে আছে। রোজ রাতে ফ্যাতাড়ুদের একটা না একটা প্রোগ্রাম থাকে। যেমন আজকের প্রোগ্রাম হল ফ্লোটেল।

—ফ্লোটেল?

—হ্যাঁ, গঙ্গাবক্ষে চালু হয়েছে না ফ্লোটেল—ওপরে মেমমাগী নাচে, বড়লোকরা ফুর্তি করে, গানবাজনা, খানাপিনা হয়, জানো না?

—জানি না আবার? শুনেছিলুম তো শেয়ার ছাড়বে এন আর আই মালিক।

—আবার সেই শেয়ার? আজ হল অপারেশন ফ্লোটেল অর্থাৎ ভাসমান হোটেলে হানা।

—সেই ভ্যামপায়ার মাছেদের মতো?

—না, না, খুনজখম নয়। ভয় দেখানো। নোংরা করা। ভণ্ডুল করে দেওয়া। এতেই তো মজা।

—আচ্ছা, ডায়মন্ডহারবার রোডের ওপর ওই যে প্লেজার রেসর্টগুলো হয়েছে তার ওপরে ইঁটপাটকেল নিয়ে ভুতুড়ে অ্যাটাক হয়েছিল বলে কাগজে বেরিয়েছিল সেটাও কি..

—হ্যাঁ, ওটাও ফ্যাতাড়ুদের কাজ। তুমি ভালো ফ্যাতাড়ু হয়েছ। তোমায় দিয়ে হবে। ঘপাঘপ সব বুঝে ফেলছ।

—কী করে হলাম সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

—প্রপার কোয়ালিফিকেশন থাকার দরকার। বড় বড় অফিসে গেলে, দেখা করছে না, বসিয়ে রাখছে, তুমিও থেমে থাকার পাত্র নয়—মনে মনে খিস্তি করছ, নাক খুঁটে চেয়ারের হাতলে লাগাচ্ছ, নখ দিয়ে চিমটে চিমটে গদি ছিঁড়ছ, বল এমনটি করনি?

হ্যাঁ। করছি।

—ড্যামেজ। পারলেই ড্যামেজ করো। এইটা মাথায় থাকতে হবে। এরকম যারা করে তাদের আমরা রিক্রুট করি। একেবারে যেগুলো হোপলেস্ কেস, আধমরা, লাতখোর

ছেলে—এই সবের থেকে—বেছে বেছে···

—আমি না অনেক অফিসের ল্যাভেটরিতে ঢুকে আয়না ভেঙেছি, বেসিন ফাটিয়েছি, নোংরা কথা লিখেছি···

—সে কি আর আমরা জানি না?

—অথচ ছোটবেলায় কী ভালোই না ছিলুম। ২৩ জানুয়ারি পাড়ার তেলেভাজার দোকানে মিনিমাগনা দুটো করে ফুলুরি দিত। খেতাম। তারপর অনেকে মিলে চেঁচাতাম—নেতাজি ফিরে এস।

—জানি।

—বাপ র‍্যান্ডাম প্যাঁদাত। বড় হলাম। ধান্দা করতে শিখলাম। বিয়ে থা হল। তারপর তো যা হবার, যাকে ভাবলুম বন্ধু তারই সঙ্গে বউ ভাগলবা···

—কারেক্ট, কারেক্ট···

কিছুই হল না লাইফে।

ডি এস ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

—ছিঃ ডি এস! ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করলে তোমারও মন খারাপ হবে, আমারও। আজ চান্স নেই। তা না হলে তোমাকে একটু মজা দেখাতাম।

—কীসের মজা।

—বেডরুম সিনস্। উঁকি ঝুঁকি! পিপিং টম!

—বল কী ভায়া!

—জব্বর সব খেল! হাই রাইজের ওপরে! কখনো কখনো ছাদে। ছাদে সুইমিং পুল!

—আর বলো না! গরমে যাচ্ছি!

—এতেই?

—যাব না? কতদিন হয়নি!

—যাই হোক এবার মন থেকে ওসব অসভ্য চিন্তা বাদ দিয়ে সামনের নীচে তাকাও! কী তাজ্জব আলোর হার অন্ধকারের গলায় ঝুলছে। ডি এস অবাক হয়ে যায়।

—আমরা ঠিক পুলের মাঝখানে ল্যান্ড করব, বুঝলে?

—শুনেছিলুম দাঁড়াতে দেয় না।

—ওসব আইন ফ্যাতাড়ুরা কেয়ার করে না।

মদন আর ডি এস হাঁপাতে হাঁপাতে পুলের ওপরে নামল। আকাশে ঝিনুক ঝিনুক মেঘে চাঁদ আবার আড়াল হয়েছে। এক ঘোলাটে আভা দেখা যায়। দেদারে হাওয়া। হাওয়ায় সব চৌপাট করে দিচ্ছে।

—ভাই মদন, এই যে ফ্যাতাড়ু হলাম, এরপরে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারব? যেমন ধরো ভোট দেওয়া, বাজার করা, ভাইফোঁটা নিতে যাওয়া···

—কেন পারবে না, সবই পারবে। তবে সব সময় মনে হবে যে তুমি ফ্যাতাড়ু। কে জানতে যাচ্ছে তুমি ফ্যাতাড়ু কিনা।

—আচ্ছা, ফ্যাতাড়ুদের মধ্যেও কি কংগ্রেস-সি পি এম হয়?

—হয় বইকী! আকছার হয়। তবে ফ্যাতাড়ুদের প্রোগ্রামে সব সময় জয়েন্ট অ্যাকশন।

—ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

—আমারও।

—কিছুক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাক, ঘুম চলে যাবে।

পুলিশের সঙ্গে বাওয়াল

ওদের চটকা ভাঙল মোটর সাইকেলের শব্দে। বিরাট চেহারার এক সার্জেন্ট। ব্যাটা রাত্তিরে গগলস্ পরে আছে বলে আরো কিম্ভূত দেখাচ্ছে। লোকটা মোটরসাইকেল গর্‌গর্ করে চালু রেখে বলল।

—এই, এই, আপনাদের গাড়ি কোথায় রেখেছেন। জানেন না এখানে দাঁড়ানো বারণ। আর শুয়ে থাকা তো আউট অব্ কোশ্চেন। চলুন, এক মিনিটও নয়···

—আমরা তো গাড়ি করে আসিনি।

—মানে? হেঁটে ব্রিজে ওঠা তো বারণ।

—আমরা হেঁটে উঠিনি। উড়ে এসেছি।

—মানে? চ্যাংড়ামি হচ্ছে! কী আছে আপনার ওই ব্রিফকেসে? খুলুন তো! স্ট্রেঞ্জ।

—এই ডি এস! খুলবে না।

—খুলবে না মানে, বাপ খুলবে! আমি আপনাদের অ্যারেস্ট করব!

সার্জেন্টের হাতটা কোমরের রিভলভারের দিকে এগোয়। কিন্তু আর কিছু করা সম্ভব হয় না কারণ মদন ও ডি এস হাত নেড়ে জমি ছাড়ে এবং উঠতে থাকে। সব রোয়াবটোয়াব উবে গেছে। গগলস্ টান মেরে খুলে সার্জেন্ট ঠাকুরের নাম করতে থাকে। ওপরে দেখা যায় দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজের প্রথম চূড়ার কাছে আলোকমালার মধ্যে মদন ও ডি এস হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে উড়ছে। এইভাবেই দুঃসাহসী স্কাই ডাইভাররা ওড়ে।

—চলো, ব্যাটাকে যা ঘাবড়ে দিয়েছি না!

—এবারে কোথায়?

—সেকী? হোটেল!

ঝাঁকের কই হও

অন্ধকার হাওড়ার দিক থেকে 'ওলে, ওলে!' শোনা গেল।

—ওই এসে পড়েছে!

—কারা!

—হাওড়ার সব মাল। এঁদো গলি ঘুঁজিতে গেঁড়িগুগলির মতো থাকে। ফাঁকা জায়গা পেলে খুব খোলতাই—ওদের আওয়াজই আলাদা।

অন্ধকারে আরো ঝটপট হাওয়া কাটা শব্দের মধ্যে 'লায়লা, ও লায়লা' রণধ্বনি শোনা যায়।

—খিদিরপুর, একবালপুর, কাঁটাপুকুর—সব আসছে। ওদের আওয়াজ শুনলেই বুঝবে—বিটক্যাওড়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই শব্দে আকাশ ভরে যায়।

—ওই যে গ্যাংটা দেখছ না, হাতে আংটি, ধুতি শার্ট পরা, ওরা হল সব চিটিংবাজ। নর্থ ক্যালকাটার। অবশ্য চার পাঁচটা দোকানদারও রয়েছে।

ডি এসের পাশ দিয়ে ঝাঁটা, তোলা উনুন ভাঙা, ভাঁড়ের মধ্যে পচা আলুর দম, পাঁঠার

মাথার ঘুগনি নিয়ে একটি নাইলন শাড়ি পরা মেয়েদের ঝাঁক খলবল করতে করতে উড়ে গেল। কয়েকটা মোটা বুড়ীও রয়েছে। একটি উড়ুক্কু মেয়ে উড়ন্ত ডি এসকে বগলে কুড়কুড়ি দেয় ও খিলখিল করে হাসে। ঝাঁকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে মদন ডি এস-এর কানে কানে বলে।

—এ হল সব সোনাগাছি গরানহাটা ভাল্লুকপাড়ার মাগের পাল। একদম ঘাঁটাবে না। আর ওই যে ডানদিক ঘেঁষে ঝাঁকটাকে দেখছ, ঢোল বাজিয়ে গান করছে, ওরা হল হিজড়ে ফ্যাতাড়ু। যত দেখবে তত তাজ্জব হয়ে যাবে। ওই, ওই লোকটাকে দেখ,—ওপরের পাটিতে তিনটে দাঁত, ধুকপুক ধুকপুক করছে আর পাখসাট মারছে—উনি হলেন একজন লেখক—পদ্যগদ্য আলফাল লেখে। আসলে মালমুহুরি—এরকম ফ্যাতাড়ুও পাবে।

—এ তো দেখছি ভায়া বলতে গেলে একটা এয়ার ফোর্স।

—ডি এস ডাইভ মারার জন্যে তৈরি হও!

—মানে!

—সামনে ফ্লোটেল।

আলোকোজ্জ্বল ভাসমান হোটেল বা ফ্লোটেল বড়ই নয়নাভিরাম। তলায় তলায় হংকং আয়না, সিঙ্গাপুরি বাজনা, হাওয়াই দ্বীপের ঢিমে গিটার আবার র‍্যাপ, জীবনমুখী গান প্লাস তুমি রবে নীরবে এবং সে রাতে ছিল স্পেশাল তন্দুরি নাইট। শহরের বিশিষ্ট এন আর আই সাহেবসুবো, নর্তকী, স্মাগলার, হাওলাদার, ফ্যাশন ডিজাইনার, মডেল, পলিটিশিয়ান, বিউটিশিয়ান, মালকিন, মাফিয়া, ডি সি ডি ডি, পি এ টু পিম্প, পিম্প অব্ এম ও ইউ এম পি এম এল এ কোচ, জিগোলো, সম্পাদক, কোর্টপোয়েট, কিং, কুইন সকলেই স্ব স্ব প্লেটে তন্দুরি মোজা পরা পা, তন্দুরি ব্রেস্ট, তন্দুরি রাং, তন্দুরি লিভার, তন্দুরি সিনা, তন্দুরি টেংরি, ফ্রায়েড তন্দুরি নোস, তন্দুরি আঁখি, তন্দুরি চুল উইথ রাইস নুডলস্, তন্দুরি ব্লিডিং হার্ট, তন্দুরি নাড়ি, তন্দুরি লিপস্, তন্দুরি আর্মপিট খাচ্ছিলেন। এমন সময় লাইক আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু কিছু বিষ্ঠা, ছনছন করে পড়া মূত, একটি আস্ত অ্যাটাচি কেস (দুই খোপে ডি ও এস লেখা), ভাঙা উনুন, মুড়ো ঝাঁটা, পাঁক, পচা আলুর দম ও পাঁঠার মাথার উৎকট ঘুগনি, বাতিল টুথব্রাশ, পরীক্ষার খাতা, সেলুন থেকে কুড়োনো কাটা চুল, বেড প্যান ইত্যাদি পড়তে থাকল।

—কী রকম বুঝছ ডি এস?

—লা জবাব!

—ভালো লাগল তো?

—ওফ মদন, আজ যেন জীবনে, মানে যাকে বলে ফুলফিলমেন্ট হল।

—সব জায়গায় ইংরিজি চলে না। বল, সিদ্ধিলাভ হল।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই!

নটে গাছ এখনো মুড়োয়নি

দশটি আই-উইটনেস একাউন্টস্ অব্ লেভিটেশনে মদন বা ডি এস অথবা বিপুল ফ্যাতাড়ু বাহিনীর কথা মেনে নেওয়া হয়নি।

কলকাতা পুলিশ ফ্লোটেল অ্যাটাক তদন্ত করে এবং ডি এস-এর নাম ঠিকানা খুঁটিনাটি-সহ ব্রিফ কেসটি পায়।

এক বিশিষ্ট বাহিনী, র‍্যাফ সমেত, ঘুমন্ত ডি এসকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ডি এস হাঁউমাঁউ করে কান্নাকাটি করে। লাভ হয়নি। তাকে লকআপে পাঠানো হয়। সেখানে ডি এস যখন আধোঘুমে আচ্ছন্ন তখন ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে লোহার দরজার পাল্লা ফাঁক করে যাকে ঢোকানো হয়েছিল সে দু-পাটি দাঁত খুলে পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকায় এবং মাড়িবিহীন ফিসফিস শব্দে ডি এসকে জানায়।

—সামান্য একটু হেনস্থা হল আর ভুলে গেলে তুমি ফ্যাতাড়ু!

—মদন, তুমি!

—মন্তর, মনে আছে?

—হ্যাঁ, ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই।

লক-আপের ঘরে একটা জানলা ছিল।

১৯৯৫